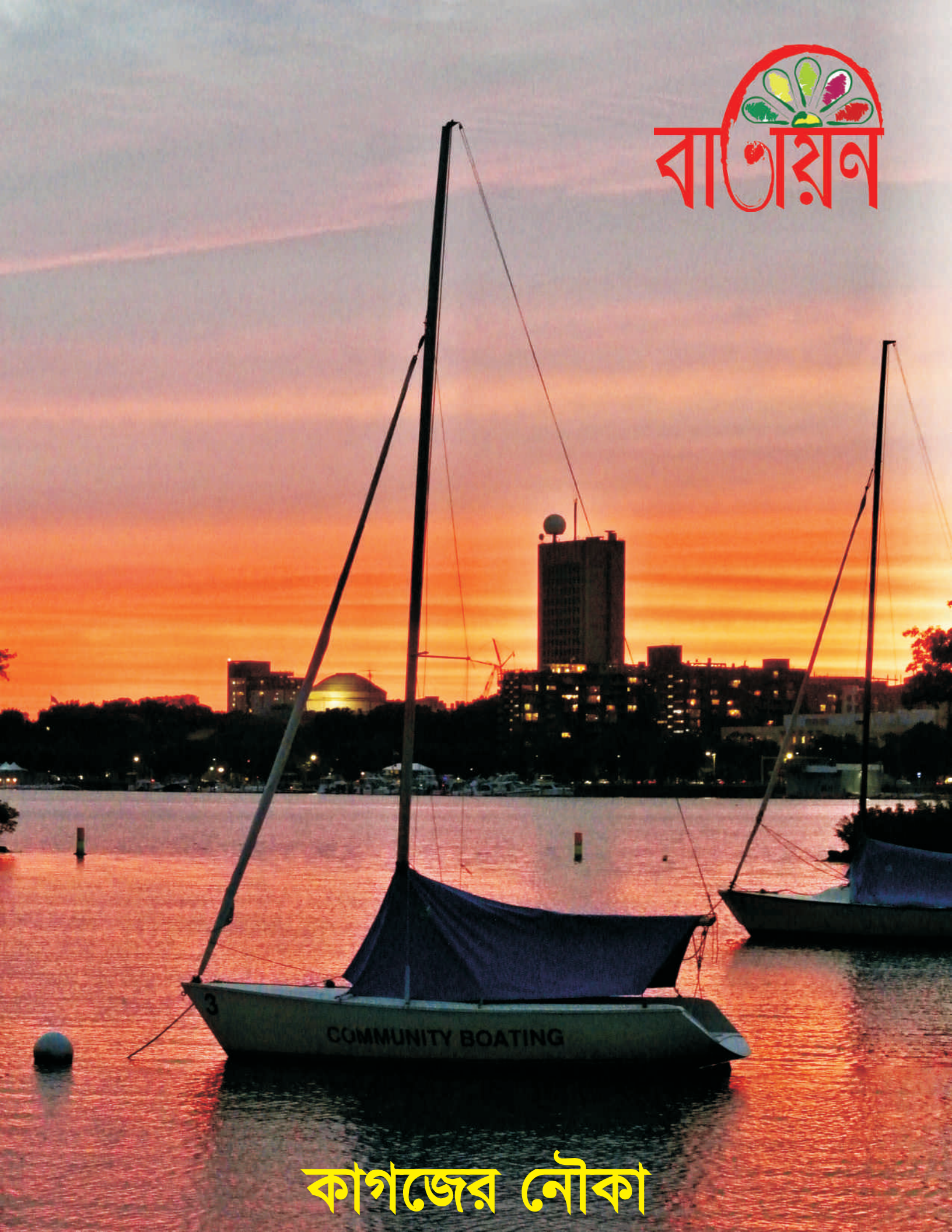

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

বাতায়ন

নতুন ভুবনের পারে

Durba

Srijato

Tanmoy

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

২২তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সম্পাদনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী

বাতায়ন

Issue Number 22 : February, 2023

Editor
Sanjoy Chakraborty
Sydney

Group Editor
Ranjita Chattopadhyay
Chicago

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Sydney

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata

Website Design and Support
Susanta Nandi, Kolkata

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Suvra Das **Front Cover**

Shuvra Das is a Professor of Mechanical Engineering and lives in the greater Detroit area. He graduated from IIT Kharagpur in India and finished his PhD from Iowa State University. Photography, painting, writing, theater, and travel are some of his passions. Lately, he has been spending a lot of time in political activism.

Saumen Chattopadhyay **Title Page**
IL, USA Venice is pretty

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

তখন ১৮৪২ সাল, বছরের শুরু। আর এম এস ব্রিটানিয়া জাহাজ ইংল্যান্ড থেকে পাল তুলে যাত্রা শুরু করলো। গন্তব্য সুদূর আমেরিকা। সমুদ্র পথের ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে শেষে এসে পৌঁছায় ম্যাসাচুসেটসের উপকূলে, বষ্টন শহরে। ব্রিটানিয়া জাহাজ সেদিন অচেনা নতুন দেশে নিয়ে এসেছিল বিশ্বসাহিত্যের প্রখর উজ্জ্বল এক প্রজ্ঞা'কে, সারা বিশ্ব যাকে এক কথায় চেনে চার্লস ডিকেন্স নামে।

২০২৩ এর নতুন বছরের শুরুতে পাঠকের প্রিয় "কাগজের নৌকা" ভেসে এলো অবশেষে, সাথে নিয়ে এসেছে দেশ ও বিদেশের লেখক লেখিকাদের উজ্জ্বল সৃষ্টি সমাহার, প্রতিবারের মতো।

ডিকেন্সের সাহিত্যে তৎকালীন আঠেরোশো শতকের ব্রিটিশ সমাজে চা-পানের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, "পিকউইক পেপার" অথবা "বার্নাবি রূজ" নভেলে। শীতের লন্ডনে যখন বয়ে যাচ্ছে উত্তরে হাওয়া, তখন তাকে অগ্রাহ্য করার উষ্ণতাকে এগিয়ে দিচ্ছে ধূমায়িত এক কাপ চা।

কলকাতা বইমেলা ২০২৩। প্রকাশিত হলো কাগজের নৌকার নিয়মিত ধারাবাহিক, ধূমায়িত এক কাপ চা'য়ের গল্পো। বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমতী রমা জোয়ারদারের উপন্যাস "চা-ঘর"। সঙ্গে প্রকাশিত আরো অনেকের কবিতার বই ও গল্পসমগ্র। আশা করি পাঠকের মননে স্থান পাবে তারা।

সদ্য অতিক্রম হলো আপামর বাঙালির মাতৃভাষাকে ভালোবাসার দিন, ভাষা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি। দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালির মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চায় শত প্রতিকূলতা ভেদ করে বোধকরি প্রতিদিনই হয়ে ওঠে একুশে ফেব্রুয়ারি। এই ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ুক নতুন বছরে, ২০২৩ এর কোণায় কোণায় কাগজের নৌকার সঙ্গে, এইটুকু আশা রাখি ...

নতুন বছর সবার ভালো হোক।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
সিডনি

সূচীপত্র

ধারাবাহিক

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়	**ছায়া সীমানা**	11
সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	**চল নিধুবনে**	28
সৌমিত্র চক্রবর্তী	**সময়**	52
ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়	**কয়েকটি শেষ না হওয়া ভূতের গল্প**	75

কবিতা

পারিজাত ব্যানার্জী	**এক বেকার মননশীলতা**	5
	মৃতা দুহিতার আত্মকথা	5
তাপস কুমার রায়	**কপালের টিপ: গল্প কবিতা**	6

গল্প

সৌমিক বসু	**“অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় দু:খিত”**	67
অর্পিতা চ্যাটার্জি	**গল্প লেখার গল্প**	70
স্বর্ণালী সাহা	**কলকাতায় মহাবিশ্ব মহাকাশ: এম.পি.বিড়লা তারামণ্ডলে**	77

ভ্রমণ

সন্দীপ ভট্টাচার্যী	**তাওয়াঙ ভ্রমণ**	79

রান্নাবান্না

মহুয়া সেনগুপ্ত	**অন্নপূর্ণার হেঁশেল**	86

পারিজাত ব্যানার্জী

এক বেকার মননশীলতা

আবার মাঝরাতের আতসবাজির আওয়াজ আজ ভাঙিয়ে দিল ঘুম।
ঘামে-ভেজা বিছানায় উঠে বসতেই ভাঙল চমক – পথ হারালো চুপ করে নিঝুম।

এ গোলাবর্ষণ দেয় না কোনো আনন্দোদ্দীপক ঠিকানা –
নিশ্ছিদ্র গ্রন্থির হাহাকারের বিলাস তার ছিন্ন ঝুলিতে যে এ যুগেও সয়না।

সব ঠিক থাকলে আজ যাহোক একটা কাজ জুটিয়ে মৌলীকে নিয়ে আসতাম ঘরে –
তার বদলে মর্গে যাওয়ার তোড়জোড় বাকি এখন – ওর দেওয়া নীল জামাটা গায়ে গলাবো আর কিছুক্ষণ পরে।

ওরা তো শুনেছিলাম দেশ রক্ষক – তবে আমার মৌলীকে ভক্ষণ করল কেন ?
অবশ্য, পিশাচ একবার জাগ্রত হলে শুনেছি নষ্ট হয়ে যায় সভ্যতা আর মধ্যবর্তী যে কটা পরে থাকে তৃণ!

মৃতা দুহিতার আত্মকথা

গোলাগুলি আর ধ্বংসের মধ্যে থাকতে থাকতে যখন হাঁপিয়ে ওঠে ওদের অবচেতন –
তখন ওদের "মেয়ে লাগে" – নাহলে যুদ্ধে আর তেমন করে বসাতে পারেনা মন।

আমিই হতভাগ্য – তাই দেশের জন্য "শহীদ" হয়েও খুঁজি ভালোবাসার চাদর –
কাল সকালে কৃষ্ণেন্দু আসবে – গুনতে থাকি সেই না শেষ হওয়া প্রহর!

লজ্জা আর চাপা পড়েনা নিশ্ছিদ্র দুর্গন্ধে ভরা মৃতদেহদের স্তুপের মাঝে,
কাল আমার জন্য পোড়া গোলাপ এনো, কেমন, পুঁতে দিও নিজের হাতে আমার শরীরের কোনো খাঁজে!

আবার যদি কখনও ফিরে আসো পরে বেহিসাবী কোনো লগ্নে –
মহীরুহ তোমায় অভিবাদন জানাবে দেখো ঠিক, স্পর্শ করবে পরম যত্নে!

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

তাপস কুমার রায়

কপালের টিপ: গল্প কবিতা

মুখবন্ধ

আজ অবাঞ্ছিত আসবাব সরাতে চেয়ে
অনেক পুরনো এক সুটকেস খুঁজে পেলাম

বেসমেন্ট পড়েছিল এতদিন
সঙ্গে এসেছিল এদেশে আমি এসেছিলাম যেদিন।
মায়ের পুরনো কাশ্মীরি শাল পুরনো পাঞ্জাবীও
ভাঁজ খুলতেই ন্যাপথলিনের গন্ধ ঝাঁজালো
গন্ধের তীব্রতা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে এলো
পাঞ্জাবীর গায়ে লেখা স্মৃতিও

ধীরে ধীরে ওলট পালো সেসব দিন পুরনো
বেসমেন্টের বোবা বাতাসে বিষাদ ঘনাল।

১

এসো আমি এক শহরের কথা বলি হতেই পারে কলকাতা বা ঢাকা
ভারী বর্ষায় মন ভাসে আনাচ কানাচে বাড়ি ঘর দোকান hoarding ঘন বিষাদ মাখা
জল জমে কাকের ভেজা ঠোঁটে জল জমে শিকারি চোখে
তোমার নিরীহ গোড়ালি ভেজে জল থৈ থৈ ফুটপাথে

মরা ট্রাম ডিপো, বসা রেল-গুমটি ধূসর
ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি ফোঁটা শহরের অনতি দূরে শহরেরই ছবি আঁকে।

রিক্সারা ভেজে রিক্সা-ওলারাও অবিচল
টানা হুডের ভেতরে আষ্টে পৃষ্টে অসম ছাটে ভেজে রূপসী বয়সকাল

ভেজো তুমি আমিও ভিজি ভেজে না ভেজার বায়না
চায়ের দোকান ভেজে, সাইন বোর্ড, দেওয়াল গুমটি বাষ্প জমে চশমা কাঁচে বাসের নম্বর ধরেনা।
জানালার হলুদ গ্রিলে জল জমে হলুদ জলের বিন্দুরা চেয়ে থাকে কথাও যায়না।

২

আকাশী নীল পাঞ্জাবী তুমি দিয়েছিলে, ঈদে বা পুজোয়
আমি আসলেই কতো চিকন ছিলাম
তুমি ছিলে আমার রাতের তৃতীয় প্রহরে স্বপ্নে আসা পরী
'যখন যেখানে যেমন সাজোও', তোমার মন খারাপের সং।
দুজনেই আনমনা ক্লাসরুমে একে ওপরের পানে চেয়ে
ম্যাডামের গলা ছাপিয়ে পিরিয়ড শেষের ঘণ্টা ঢং ঢং।

আমরা একসাথে স্টাডি ব্রেক আমরা একসাথে বইমেলা
লেকের বেঞ্চে বসে সন্ধ্যার অভিমানী আলো
আঁধার গাঢ় হলে ক্রমে মুছে যায় বাতিওয়ালা।

আর আমি ?
দ্বিতীয় বর্ষে দুজনেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ফেল

৩

এইখানে এসে একদিন হঠাৎই চৌরাস্তার মোড়ে
তোমার পিঠের ঘাম আর তোমার গ্রীবার রোমে
আমি শিল্পের ঠিকানা খুঁজে পেলাম।
মাইকেল এঞ্জেলো একদিন এরকমই পেয়েছিলো
আমিও ছাপোষা স্টুডেন্ট থেকে শিল্পী হতে চেয়ে
রাতদিন যেখানে যেমন পেয়ে
হাত পাকালাম ও ফাগুন পায়ের ছবি এঁকে এঁকে।

আরেকবার ভারি বর্ষায়
শহর অঝোরে ভিজে চলে

দুপুরের খোলা ছাদে ভেজা কাক হয়ে
আমরা দুজন তোমাদের ফাঁকা বাড়ির দেড়তলা ঘরে
গাঢ় শ্বাস প্রশ্বাস, রেডিওতে মেঘমল্লার
জানালার পর্দারা কতো কানাকানি ফিসফাস
শহরের কার্নিশ থেকে কার্নিশে খবরের ছয়লাপ

যুবক যুবতী খোলস ছাড়িয়া
আদম ও ইভ হল আজ।

৪

তারপর একদিন ম্লান সন্ধ্যায়
পাখিরা ফিরেছে সবে শঙ্খ বাজে আঙিনায় আঙিনায়
ইউনিভার্সিটির অফার লেটার এলো গোলাপি খামে

কথা ছিল কদিনের দূরত্ব মনখারাপ বিরহ
তারপর একদিন ঝর্ণা খুঁজে নেবো
ছোটো এক কাঠের বাসা পাহাড়ের নিচে
সকালের চায়ে তর্ক ঝগড়া মন কাটাকাটি
তুমুল, সারা দিন বন্ধ মুখ দেখাদেখি

মন গলবে ধীরে ধীরে বিকেলের দিকে
সঙ্গম আছিলায় ভাব রাত্রি কিনারে।

৫

আসার দিন তোমার সাথে শেষ দেখা
সেদিন তোমার সাজ দেখে মনে হয়েছিল
গায়ে এই আকাশী নীল পাঞ্জাবী।
আমি এ নারীকে খুবই অল্প চিনি।

হঠাৎ বৃষ্টি এলো ঢেকে দিলো মনুমেন্ট মাথা
বুড়িগঙ্গায় ধূসর মনখারাপ বন্ধ ফেরার সব রাস্তা

রিক্সা থেকে নেমে ট্যাক্সি নিলাম আমরা
অসম্ভব গম্ভীর তোমার মুখ খুব কম কথা সারাটা রাস্তা
বার বার ঘড়ি দেখছিলে আর থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস

কি ভীষণ যান জট, রাত নয়টায় উড়ান
আমার দেশ ছেড়ে যাওয়ার বাংলাদেশ বিমান

তাড়াহুড়ো নেমে যাবো আমি
বাসা অব্দি যাওয়া যাবেনা
বাকিটুকু পথ ছুটে বৃষ্টিতে ভিজে
ধূসরে ধূসর আমি তুমি ট্যাক্সিতে বসে

তাড়াহুড়ো নেমে যাবো আমি
ভাবলাম চুমু খাই ও ঠোঁটে
সামনে ট্যাক্সি চালক আব্বার বয়সী
তুমি শাসলে আমায় একদম না

তোমার সে চোখে নির্জন দ্বীপে চাঁদ এসে বসে
দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে জানালার কাঁচে
জানালার কাঁচে জল জল লেগে চোখে আর গালে
ঠোঁট কাঁপে তিরতির সাগর হাওয়ায় যেমন লোনা গাছ কাঁপে

হাত খুঁজে নিলে ত্রস্ত ও হাতে
বুকের ভিতর থেকে তুলে আনলে খাম
যেমন কলম ভাঙে বিচারক বিচারের শেষে।
বললে না পৌঁছনো অবধি খুলবেনা কথা দাও
ভাবলাম মেয়েলি প্রেমপত্র অথবা কবিতা কোনও

হাতে নিয়ে বলি কই
খামে আঠা নেই নেই সেলোটেপও
বিভ্রান্ত সে রমণী সহসা চকিতে
কপালের টিপ খুলে খাম দিলো এঁটে।

মাছ ধরা নৌকোরা রাতের অতলে কাছে দূরে দোলে
সন্ধ্যার যে ইঙ্গিতে শেষ পাখি ঘরে ফিরে আসে

আমার পাঞ্জাবি তে ঢুকিয়ে বললে ভালো থেকো
আমি নেমে গেলাম জল জমা গলিটার মুখে

ট্রাফিকের আলো পালটাল
তুমি পালটালে
লাল আলো নেমে এলো শহরের বুকে
ট্যাক্সি তোমাকে নিয়ে হারাল অনন্ত যানজটে

তারপরের কিছুদিন চুরি হয়ে যায়
অক্ষাংশ দ্রাঘিমায়
বরফ পাহাড় গাছ বাড়ি জানালায় দূরে দূরে
আলো জ্বলে ধোঁয়া ওঠে চিমনির মুখে
বেওয়ারিশ ঘুম ঘুমের হিমঘর
স্বপ্নে তুমি এসেছিলে যাদু পরী সেজে
একদিন আচমকা দাওয়াত পেয়ে পাঞ্জাবী পড়ে
হাত লেগে যায় তোমার সে খামে ...
বুকে শ্বাস ভরে খাম খুলি
শাদীর কার্ড সাথে ঝকঝকে তরুণ তরুণী
সামনে খাঁড়ায়
.....
.....
শুনেছি
অধুনা ওদের বাস ব্রঙ্কসভিল পাড়ায়।

উপসংহার

পুরনো আকাশী নীল পাঞ্জাবী
অভ্যাস মাফিক পকেটে হাত দিয়ে দেখি

সে টিপ এখনো আছে
আঠা মরে গেছে কবে

আমরা সকলেই চলে আসি দূরে
পিছে পড়ে থাকে সময়ের ভবঘুরে।

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়া সীমানা

পর্ব ৩

(৭)

সঞ্জয় আর তার বৌয়ের চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শর্মিলা। সঞ্জয়ের কাছ থেকে এতখানি উপেক্ষা, অবমাননা যে কোনদিন তার প্রাপ্য ছিল, স্বপ্নেও ভাবে নি সে।

মাত্র কয়েক বছর আগে অবধি শর্মিলা নিজেকে সম্রাজ্ঞী জ্ঞান করত। অবশ্য সে রকমটা মনে করার অনেক কারণও ভাগ্য ওকে জুটিয়ে দিয়েছিল। দিল্লীর এক অত্যন্ত ধনী পরিবারে, তিনটি ছেলের পর, শর্মিলা এসেছিল একমাত্র মেয়ে হয়ে। ওকে গড়তে বসে বিধাতা পুরুষ বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে, বৃহস্পতিদেবের আশীর্বাদে তীক্ষ্ণ মেধাও পেয়েছিল শর্মিলা। পরিবারের আর্থিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠাও ছিল অনুকূল।

অল্প বয়স থেকেই নাচ, গান এবং পিয়ানো শেখার তালিম আরম্ভ করে সে। পনেরো-ষোল বছর বয়সে ওডিসি নাচে এবং উত্তর ভারতীয় ক্লাসিকাল গানে নিপুণা হয়ে উঠেছিল।

কৈশোর থেকেই সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং নৃত্য-গীত-পটিয়সী শর্মিলার অনেক স্তাবক জুটে গিয়েছিল। বাড়িতেও সে সকলের নয়নের মণি।

কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার পর, শর্মিলার বাবা তাকে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে পাঠিয়ে দিলেন উচ্চ শিক্ষার জন্য। লেখাপড়ায় সে যদিও কোন রকম গাফিলতি করে নি কোনদিনই, ব্রিসবেনে গিয়েও ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হবার পর, শর্মিলার রূপ-গুণমুগ্ধ ভক্তদের অভাব হল না। ক্রমশঃ রূপ, মেধা এবং প্রবল আত্মবিশ্বাসের জোরে শর্মিলা আসীন হল স্বয়ং দেবী এথিনার সিংহাসনে।

জিউস-কন্যা এথিনা। মহাকালী যেমন স্বয়ং দেবী দুর্গার কপাল থেকে উদ্‌গত হয়েছিলেন, গ্রীক দেবী এথিনাও জিউসের মস্তক ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, যোদ্ধাবেশে। কিন্তু শুধু যোদ্ধার তেজস্বিতাই নয়, এথিনাকে প্রাচীন গ্রীকেরা পূজা করত শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের দেবী রূপে।

তা মাত্র তিন বছর আগে অবধি তো এথিনার আশীর্বাদ-সমৃদ্ধ শর্মিলা, তাঁর অদৃশ্য সিংহাসনে বসে জীবনকে নিরবিচ্ছিন্ন উপভোগ করছিল।

কিন্তু সহসা ঘটল ছন্দপতন। শর্মিলা বসুর জীবনে বিপর্যয় নেমে এলো। সেই বিপর্যয়ের নাম সুশান্ত রায়।

শর্মিলা বসুর পরিবারের মতই সুশান্ত রায়ের পরিবারও গত কয়েক পুরুষ ধরে অতি বিত্তশালী ব্যবসায়ী। আধুনিক সময়ের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, ব্যবসায়ের বর্তমান মালিক সাংবাদিক প্রণব রায় নিজেদের পারিবারিক ব্যবসাকে একটা নতুন মোড় দিয়ে ডিজিটাল মিডিয়া জগতের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। লঞ্চ করেছিলেন টেলিভিসন চ্যানেল। এরপর তাঁকে আর পিছনে তাকাতে হয় নি। খ্যাতির সঙ্গে অপরিসীম সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনি।

এহেন স্বনামধন্য প্রণব রায়ের একটিমাত্র পুত্র সুশান্ত রায়। একদিন হঠাৎই সুশান্তর সঙ্গে শর্মিলার দেখা হয়ে গেল একটা জন্মদিনের পার্টিতে। জন্মদিনটা ছিল শর্মিলার এক সহকর্মিণীর।

– "ঐ লোকটি কে? নতুন মুখ, না"? শর্মিলা জিজ্ঞেস করেছিল।

তারপর বান্ধবীর কথায় জেনেছিল, অপরিচিত লোকটির নাম সুশান্ত রায়। স্থানীয় মিডিয়া ম্যাগ্‌নেট এবং সাংবাদিক প্রণব রায়ের একমাত্র ছেলে এবং উত্তরাধিকারী।

"এই ধরনের পার্টিতে ও আসে না," সহকর্মিনীটি বলেছিল, "কিন্তু আমাদের দুজনের পরিবারের বহু বছরের যোগাযোগ। তাই হয়ত' এসেছে সুশান্ত, ওর মায়ের কাকুতি-মিনতির ঠেলায়। আসলে আন্টি খুব চান তাঁর ছেলেটি মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে"।

– "ও," বলে খানিক দূর থেকে সুশান্তর দিকে তাকিয়ে ছিল শর্মিলা।

– "হী ইজ ভেরি মচ্ আ লেডিস্ ম্যান", বান্ধবীটি হাসতে হাসতে বলেছিল, "বট্ ইউ নো, হী নেভার কেয়ার্স অ্যাবাউট গর্লস্। মেয়েদের পাত্তাই দেয় না মোটে। ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-সার্কালে সবাই ছেলে"।

– কি করে সুশান্ত রায়?

– সেও তার বাবার মত সাংবাদিক। লন্ডন স্কুল অফ্ জর্নলিস্‌ম্ থেকে গ্র্যাজুয়েট করেছে।

– হুম্", বলে সুশান্ত রায়ের দিকে আরও খানিক এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল শর্মিলা। চোখাচোখি হল সুশান্তর সঙ্গে। কিন্তু ওকে দেখে বিন্দুমাত্র হেলদোল হল না সুশান্তর। শর্মিলা একটু বিচলিত হল। সে আর একটু এগিয়ে গিয়ে খুব কাছে দাঁড়িয়ে ওকে মন দিয়ে লক্ষ্য করল। ছ'ফুটের ওপর লম্বা দোহারা চেহারা সুশান্তর। পরনে জীন্‌স্ আর লাল টী শার্ট। দেখতে অতি সাধারণ। অথচ ওকে দেখে চোখও ফিরিয়ে নেওয়া যায় না চট্ করে। তখন একদল তরুণ ও তরুণী আবৃত্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুশান্ত রায়। সবার হাতেই ধরা ছিল বাহারে গ্লাসে হাল্কা পানীয়।

সারাটা সন্ধ্যা কেটে গিয়েছিল অতঃপর, কিন্তু সুশান্তর সঙ্গে কেউ আলাপ করিয়ে দেয় নি শর্মিলার। বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিল সে।

সুশান্তর সঙ্গে পরিচয় ঘটল না বটে, কিন্তু ওর সম্বন্ধে একটা ধারণা নিজের মনেই তৈরি করে নিল শর্মিলা। যে সব বিশেষণের সঙ্গে সুশান্ত রায়কে সংযুক্ত করল সে, তার মধ্যে ছিল মেল শভিনিস্‌ট্, বেপরোয়া, উদ্দন্ড এবং লড়াকু।

শর্মিলা এরকম পুরুষ আগে দেখে নি। সে প্রায়ই মনে মনে কল্পনা করতে লাগল, সমস্ত পৌরুষ জলাঞ্জলি দিয়ে একদিন অবশ্যই সুশান্ত রায় আসবে তার কাছে। নিজেকে সঁপে দেবে শর্মিলার পায়ে।

কয়েকটা মাস কেটে গেল। কিন্তু শর্মিলার কল্পনা সাকার হল না। সুশান্ত রায়ের সঙ্গে ওর দেখাই হল না এর মধ্যে!

অবশেষে একদিন ধৈর্য হারিয়ে সে তার মায়ের কাছে গিয়ে বলল, সুশান্ত রায়কে ওর পছন্দ। সুশান্তর সঙ্গে যেন শর্মিলার বিয়ের চেষ্টা করেন তাঁরা। মেয়ের অমন ওপর-পড়া, নির্লজ্জতায় অবাক হয়ে গেলেন শর্মিলার মা! কিন্তু পরে ভেবে দেখলেন, তেমন কিছু অন্যায্য কথাও বলে নি তাঁর মেয়ে। সত্যিই তো! রূপে, গুণে, বিদ্যায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় – কোন দিকেই তো শর্মিলা ফ্যাল্‌না নয়। প্রণব রায়ের পরিবারের উপযুক্তই তাঁর মেয়ে।

সুশান্তর সঙ্গে নিজেদের মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে অতএব এক সন্ধ্যায় দিল্লীর গল্‌ফ্ গ্রীন ক্লাবে দেখা করলেন ওঁরা প্রণব রায় ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে।

প্রণব রয় এবং তাঁর স্ত্রী সেই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে যেন হাতে চাঁদ পেলেন তাঁরা সোৎসাহে গ্রহণ করলেন শর্মিলার বাবা-মায়ের প্রস্তাব।

মাসখানেকের মধ্যে দুই পরিবারের উদ্যোগে বিয়ের কথা-বার্ত্তা পাকা হয়ে গেল। এবার শুধু ছেলে আর মেয়ের একবার মুখোমুখি আলাপ করার পালা।

একদিন দুপুরবেলা প্রণব রায় তাঁর ছেলের ঘরে এসে বললেন, "আজ সন্ধ্যায় তোমাকে একবার তোমার ভাবী স্ত্রী শর্মিলা বসুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে, সুশান্ত। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় তোমাদের জন্য ক্ল্যারিজ সেভিলাতে ডিনর বুকিং করে রাখা হয়েছে। শর্মিলাকেও আমন্ত্রণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ তোমাকে নিয়ে যাবে ঠিক সময়ে। প্লীজ টর্ন অপ্ অন্ টাইম"। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে তাঁর আবার কি যেন মনে পড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "বাই দ্য ওয়ে, শর্মিলা বসু দিল্লীর একজন খুব বড় ইন্ডস্ট্রিয়ালিস্টের মেয়ে। বহু বছর সে বিদেশে থেকে পড়াশোনা করেছে তোমার মতই। অ্যান্ড সী ইজ্ আ মেডিকল ডক্টর"। এত কথা বলার পর, তিনি ছেলেকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

শর্মিলা বসু! তার ভাবী স্ত্রী! আকাশ থেকে যেন মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল সুশান্ত। সে কিছুদিন ধরে অনুমান করছিল যে তাকে নিয়ে বাবা-মা তলে তলে একটা কিছু প্ল্যান করছেন; কিন্তু ওর মতামত না নিয়েই তাঁরা ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলবেন, এটা ছিল সুশান্তর স্বপ্নাতীত। সমবয়সী বন্ধুমহলে তার যতই বেপরোয়া, উদ্ধত আর মাচো ইমেজ থাক না কেন, বাবা-মাকে সুশান্ত খুব সমীহ করে চলে। তাঁদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে "খুলে আম" বিদ্রোহ সে কখনো করে নি। সেদিনও করল না। শুধু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর ওদের বাড়ির আট নম্বর বি. এম. ডব্লু. গাড়ির ড্রাইভর প্রকাশের ঘন ঘন তাগিদের জ্বালায়, অগত্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ, সাজগোজ করে তাকে বেরিয়ে পড়তে হ'ল ক্ল্যারিজ সেভিলা অভিমুখে।

মনে মনে তখন সে ভাবছে, কি বলবে শর্মিলা বসুকে!

রেস্টোরেন্টে ঢুকতেই একজন রিসেপ্শনিস্ট এগিয়ে এসে বলল, "আর ইউ ইন্ডস্ট্রিয়ালিস্ট প্রণব রয়জ সন্, স্যর"?

– ইয়েস্। আই শিওর অ্যাম্", সুশান্ত বলল।

রিসেপ্শনিস্ট সুশান্তকে ওদের জন্য নিরিবিলিতে নির্দিষ্ট টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বলল, "মিস্ বসু ইজ অন্ হর ওয়ে। সী উইল অ্যারাইভ শর্ট্লি। আপনি কি ততক্ষণে একটা ড্রিংক অর্ডার দেবেন"?

একটা পমেগ্রেনেট স্যাংগ্রিয়া অর্ডার দিল সুশান্ত।

মিনিট দশেকের মধ্যেই শর্মিলাকে টেবিলে নিয়ে এসে সুশান্তর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল রিসেপ্শনিস্ট।

ওরা দুজনে মুখোমুখি বসল অতঃপর। বেয়ারা এসে ওদের টেবিলে স্পার্ক্লিং ওয়াইন দিয়ে গেল দুজনের জন্য আর সঙ্গে কিছু হাল্কা স্ন্যাক্স।

শর্মিলার দিকে হাসিমুখে চাইল সুশান্ত। কোথাও কি দেখেছে একে! ঠিক মনে করতে পারল না। বলল, "গুড ইভনিং, শর্মিলা"।

শর্মিলা বলল, "আপনাকে আমি একবার দেখেছিলাম। অবশ্য আলাপ করা হয় নি –"।

– কোথায় দেখেছিলেন বলুন তো?

– একটা বার্থ ডে পার্টিতে। আমার এক বান্ধবী, প্রমিলা মিত্রর জন্মদিনে।

– "ও হ্যাঁ, সেই পার্টিতে গিয়েছিলাম বটে", সুশান্ত বলল। বলে ও চেয়ে রইল শর্মিলার দিকে। মনে মনে স্বীকার করল, চলনে, বলনে, চেহারায় সত্যিই মেয়েটা লাজবাব। তার ওপর আবার নাকি মেডিকল বিশেষজ্ঞ! ওয়াও! "কিন্তু –" তখুনি মনে মনে বলল, "আমার তাতে কি! আই অ্যাম নট ইন্টরেস্টেড"।

– "কি ভাবছেন বলুন তো"? পানীয়ের গ্লাসে আল্‌তো চুমুক দিল শর্মিলা।

– আমাদের কথা ভাবছি। আপনার আর আমার কথা।

– "তাই," মিষ্টি করে হেসে বলল শর্মিলা, "আচ্ছা, ফর্স্ট অফ অল, আমরা কি এই "আপনি" বলাটা ড্রপ করতে পারি? আর একে অন্যকে নাম ধরে ডাকতে পারি?"

– "সিওর। আই এগ্রি", সুশান্তও হাসল।

– হ্যাঁ এবার বলো, সুশান্ত, কি বলছিলে?

– "মনে হচ্ছে, আমাদের বাবা-মায়েরা কোন রকম সম্মতি না নিয়েই আমাদের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। তুমি কি কিছু জানো"?

– "নিশ্চয়ই জানি," মাথা নেড়ে সায় দিল শর্মিলা, "দু'মাস পর আমাদের বিয়ে, এটাও জানি"।

– "এ বিয়ে তো অন্যের নির্ধারিত! তোমার তাতে কোন আপত্তি নেই"?

– না। একটুও আপত্তি নেই। "আমার বিশ্বাস বাবা-মায়েরা তাঁদের ছেলে-মেয়ের জন্য যা ঠিক করে দেন, ইন্ দ্য লং রন্ ইট্ ওয়ার্কস্ আউট। আর তা ছাড়া, বিয়েটা যখন করতেই হবে, তখন তোমার চেয়ে ভাল পাত্র তো দুর্লভ!"।

– "আমার ঘোর অমত এই বিয়েতে", সুশান্ত ধীরে-সুস্থে বলল।

– "অমত! কেন"? শর্মিলা ভুরু কোঁচকালো, "এখানে বা বিদেশে তোমার কোন গর্ল ফ্রেন্ড আছে না কি? না, আমাকে তুমি নিজের উপযুক্ত মনে করো না"?

মনে মনে হাসল সুশান্ত। এ যে দেখছি চ্যাম্পিয়ন মেয়ে। একেবারে ফ্রী অফ্ এনি ইন্‌হিবিশন! ও মনে মনে ভাবল, অবশ্য হবেই বা না কেন! ফরেন ট্রেন্‌ড্ স্পেশলিস্ট বলে কথা!

মুখে বলল, "না, এর কোনটাই নয়। ইন্ ফ্যাক্ট কোনদিনই আমার গর্ল ফ্রেন্ড ছিল না – বিদেশেও না, এখানেও না। আর তোমাকে যে কোন পুরুষই পছন্দ করতে বাধ্য। ইউ আর জস্ট্ টু গুড"।

– "তবে? আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কিসের", সুশান্ত চুপ করে রইল।

– "না প্লীজ, বলো সুশান্ত, তোমার আপত্তি কেন"? শর্মিলার গলায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

বেয়ারা এলো অর্ডার নিতে। শর্মিলা মেনু দেখে স্প্যানিশ পায়েলা অর্ডার দিল। সঙ্গে পটাটাস্ ব্র্যাভাস্, অর্থাৎ ছোট ছোট করে কাটা চৌকো আলুভাজা। আর বেছে নিল হোয়াইট ওয়াইন।

– স্প্যানিশ ডিনর আমার খুব প্রিয়। "সেজন্যই হয়ত' বাবা আমাদের সন্ধ্যে কাটাবার জন্য এই ভেন্যুটা ঠিক করেছেন", সুশান্ত বলল, "স্প্যানিশ খাবার তোমার কেমন লাগে, শর্মিলা"?

– "ভালই লাগে", শর্মিলা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "কিন্তু তুমি বললে না তো আমাদের বিয়েতে তোমার আপত্তি কেন"?

– "কারণ বলতেই হবে"? সুশান্ত দুষ্টুমির হাসি হাসল, "কারণ, শর্মিলা, আই অ্যাম নট্ আ ম্যারিয়িং টাইপ। বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করা বা স্বামীর দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব"।

– এখন তুমি এরকমটাই মনে করছ, কিন্তু বিয়ের পর সব বদলে যাবে। দেখে নিও।

– আই ডোন্ট থিংক সো। আমার মনোভাব অপরিবর্তনীয়। তাই বলছি এই বিয়েটা তুমি নাকচ করে দাও। আমার চেয়ে অনেক ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবার যোগ্যতা আছে তোমার, বিলিভ মী"।

কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে রইল শর্মিলা। অদ্যাবধি কোন পুরুষের কাছে সে হেরে যায় নি। আর আজ, সুশান্ত রায় তাকে প্রত্যাখ্যান করল! কিছুতেই না।

বেয়ারা টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখল। তারপর দুটো গেলাসে ওয়াইন ঢেলে দিয়ে চলে গেল।

– "বাঃ! দারুণ অ্যারোমা। বোঝাই যাচ্ছে, খুব সুস্বাদু পায়েলা। দেরী না করে এবার চলো আরম্ভ করা যাক্", সুশান্ত বলল।

কয়েক চামচ খেয়ে, মুখ তুলে শর্মিলা বলল, "জস্ট্ ওয়ন্ডরিং, কাজের বাইরে তুমি কি ক'রে সময় কাটাও, সুশান্ত"?

নিজের চামচটা প্লেটের ওপর নামিয়ে রেখে, ন্যাপ্কিন দিয়ে মুখ মুছে সুশান্ত বলল, "আমার একটা বন্ধুদের গ্যাং আছে। সেখানে সবাই ছেলে আর প্রত্যেকেই মাচো। উই অলওয়েজ হ্যাঙ্গ আউট টুগেদার। অ্যান্ড ডু থিংস টুগেদর"।

– তোমার বন্ধুরা কি সকলেই বিজনেস্ মেন? খুব বড়লোক?

– বলতে পারো। ওরা সকলেই রিচ্ অ্যান্ড ইন্ফ্লুয়েন্শিয়াল।

– কি ধরনের ইন্টরেস্ট তোমাদের দলের?

– ফন্, জস্ট্ ফন্। আমরা সকলে মিলে যে কোন একটা উপলক্ষ্য খুঁজে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠি। ঘুরে বেড়াই যত্র তত্র। নাইট ক্লাবে গিয়ে হৈ-হল্লা করি। জুয়ার আড্ডায় যাই। ড্রাগের স্বাদ নিই অনেক সময়ে। আবার মোটর সাইকেল নিয়ে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ি, কখনো ডায়মন্ড হার্বর, কখনো মন্দারমণি বা কখনো কোন গ্রামের দিকে।

তার মানে, শর্মিলা ভাবল, সুশান্ত রায় আসলে বিশাল ধনী বাপের একমাত্র, বয়ে যাওয়া, বখাটে ছেলে। ব্যবসা-ট্যবসা কদ্দূর সামলায় কে জানে!

– এবার বুঝলে তো, শর্মিলা, কেন আমি বিয়ের চক্করে পড়তে চাই না?

শর্মিলা চুপচাপ।

সুশান্তর তখন স্প্যানিশ ওয়াইনের চতুর্থ গেলাস চলছে। শর্মিলাকে তার অন্তরের সব কথা উজাড় করে দেবার আগ্রহ বোধ করছে খুব। হঠাৎ বলল, "বাই দ্য ওয়ে, ইন্ কেস তুমি আমাকে "গে" মনে করে থাকো, অনেস্টলি বলছি, আমি সমকামী নই। ইন্ ফ্যাক্ট্ সেক্সের হরমোনটাই আমার মধ্যে মিসিং। বল্তে পারো আমি সেক্স্ বিরোধী। আমি এ-সেক্সুয়াল"।

– তোমার বাবা-মাকে বলে তুমিই তাহলে বিয়েটা নাকচ করছ না কেন?

– ওঁরা আমার কথা শুনবেন না। বেশ কয়েক বছর ধরে আমাকে বিয়ে দিয়ে হাউস-হেল্ড্ ম্যান, মানে সংসারী, করতে চান তাঁরা। এখন তোমাদের বাড়ি থেকে প্রস্তাব আসায় ওঁরা আমার বিয়ে দেবার জন্য একে উঠে-পড়ে লেগেছেন।

শর্মিলা এবার ধীরে-সুস্থে বলল, "এতক্ষণ ধরে তুমি নিজের সম্বন্ধে যা-যা বললে, সবই মাথায় থাকবে আমার। কিন্তু মত আমি কিছুতেই পাল্টাব না, সুশান্ত। আমাদের প্রস্তাবিত বিয়ে আমি নাকচ করব না। আই উড্ লাইক টু গো অহেড উইথ দ্য ওয়েডিং"।

স্তম্ভিত হয়ে সুশান্ত বলল, "বিয়ে নাকচ করবে না তুমি"?

– না।

* * * * *

সেই সন্ধ্যায় অত কথাবার্ত্তা, অত ওজর-আপত্তি সত্ত্বেও সুশান্ত আর শর্মিলার বিয়েটা হয়েই গেল।

সুশান্ত রায় আর শর্মিলা বসুর ঝল্‌মলে পরী-বিবাহটা শহরের সম্ভ্রান্ত মহলে বহু আলোচিত গল্প হয়ে রইল দীর্ঘ দিন।

আর শহরের দিন-আনা, দিন-খাওয়া সাধারণ মানুষজনও, চারিদিক থেকে উড়ে আসা ওদের বিয়ের কাহিনী শুনে চমকিত আর চমৎকৃত হল।

বিয়েতে সুশান্তর গ্যাংয়ের বন্ধুরা অবশ্যই বিয়েতে এসে যোগ দিয়েছিল। শর্মিলার বন্ধুরাও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। এমন কি ওর অস্ট্রেলিয়ার ছেলে বন্ধুরাও কেউ বাদ পড়ে নি। বিয়ের রাতে শর্মিলার মনে হয়েছিল বাস্তবিকই বুঝি এথিনার যোদ্ধাময়ী অস্তিত্বের অধিকারিণী সে।

কিন্তু স্ব-আরোপিত বিজয়িনী এথিনার আবেশ বিবাহিত শর্মিলার জীবনে কি স্থায়ী হয়েছিল!

না, মধুচন্দ্রিমায় যাওয়া হয় নি শর্মিলার কারণ বিয়ের কয়েক দিন পরই বন্ধুদের সঙ্গে সুশান্ত চলে গিয়েছিল আমেরিকা। ওদের সেই অভিযান নাকি মাস ছয়েক আগে থেকে ঠিক করা ছিল এবং সেটা বাতিল করা নাকি ছিল অসম্ভব!

একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলে সুশান্তর মা চেষ্টা করেছিলেন ছেলেকে ঠেকাতে। পারেন নি। ছেলে মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল, "আমার পর্সোনল ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা তুমি বা বাবা আর করতে যেও না, মা। আমার বিয়ের জন্য তোমরা অস্থির হয়ে উঠেছিল। ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তোমাদের সেই ইচ্ছাপূরণ আমি করে দিয়েছি। আর শর্মিলার সঙ্গেও, আমরা দুজনে কি ভাবে যৌথ জীবন কাটাব, তার একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। আমাদের ব্যাপারে তুমি ঢুকতে যেও না। বাবাকেও বারণ করে দিও"।

বিয়ের পর, মাস ছয়েক ধরে অনেক চেষ্টা করেছিল শর্মিলা তার স্বামীকে প্রণয় বন্ধনে আটকাবার। পারে নি। যতবার সুশান্তর সঙ্গে নিবিড় হতে চেষ্টা করেছে, সে সরে গিয়েছে। তাই বলে কোনভাবেই নব-পরিণীতা বধূর সঙ্গে সে দুর্ব্যবহার করে নি সুশান্ত। অথবা কর্কশ হয় নি। শুধু হাসিমুখে শর্মিলাকে বলেছে, "আমাদের সম্পর্কটা শুধুই বন্ধুত্বের। একটা ফর্মাল ফ্রেন্ডশিপ। সেটা মাথায় রেখো"। সুশান্তর কথা শুনে কদাচ আহত, বিষণ্ন চোখে ওর দিকে তাকালে, সে শর্মিলার কপালে ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে বলেছে, "ডোন্ট টেল্ মী, আই ডিড্ নট্ ওয়ার্ন ইউ, ডিয়র ওয়াইফ। প্রিয়তমা, তোমাকে তো আমার মনের কথা খুলে বলেছিলাম। বলি নি, বলো"?

এরপর আর শর্মিলার কিছু বলার থাকে নি। বিবাহিত জীবনের সঙ্গে নিজের মত করে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছিল সে।

ইতিমধ্যে বিনা মেঘে ঘটে গেল বজ্রপাত।

সেই রাতে একটু তাড়াতাড়ি শর্মিলা শুয়ে পড়েছিল। পরদিন সকাল সকাল হাসপাতালে ডিউটি। অথচ বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছিল না।

এ যাবৎ শর্মিলার অনড় বিশ্বাস ছিল যে ওর জীবনে নিয়মিত যাদের আনাগোনা, নিজের ব্যক্তিত্ব, আচরণ এবং সামাজিক ক্ষমতা দিয়ে তাদের সকলকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে শর্মিলা অনুভব করছে যে সে তার পরিপার্শ্বকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে পারার ক্ষমতা তো হারিয়েই ফেলছে, উপরন্তু তার নিজের জীবনটাই যেন দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিবাহিত বলে স্তাবকেরাও ক্রমশঃ ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এড়িয়ে যাচ্ছে ওকে। ব্রিসবেন আর মেলবোর্নে তার রোমান্টিক বন্ধুদের সংখ্যা তো কম ছিল না। তাদের অনেকের সঙ্গেই দৈহিক অ্যাড্‌ভেঞ্চারের উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতাও হয়েছিল তার। একমাত্র সঞ্জয় মুখার্জীই ছিল এক ব্যতিক্রম। ঘনিষ্ঠতার পরও ওকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজো করে গিয়েছিল সে! কোনমতেই ব্যবধানের শেষ গন্ডীটুকু পেরিয়ে নিবিড় হতে পারে নি ওর সঙ্গে। আবার দিল্লিতে এসেও তো বিয়ের আগে পর্যন্ত নব যুবকদের আসরে শর্মিলাই ছিল মক্ষীরানী। তারপর হঠাৎ একদিন সুশান্তকে দেখে সব গন্ডগোল হয়ে গিয়েছিল।

জীবনের বিগত কয়েকটা বছরের স্মৃতি মস্তিষ্কে আবার হানা দিয়ে অস্থির করে তুলছিল। ভাবনা চিন্তার মাঝে দীর্ঘকাল বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল সুশান্তর ডাকে। চোখ খুলে দেখল ওর বিছানার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে, প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে ডাকছে সুশান্ত।

সুশান্তর মা ওদের জন্য একটি পৃথক সুইটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিয়ের পর সেখানেই এসে উঠেছিল শর্মিলা। সেই সুইটে আছে একটা শোবার ঘর, একটা স্টডি এবং বন্ধু বান্ধবদের আপ্যায়নের জন্য একটা সুসজ্জিত বৈঠকখানা। প্রত্যেকটি ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন টয়লেট এবং বাথরুম। বিশাল কম্‌পাউন্ডের ওপর সুশান্ত-শর্মিলার সেই কক্ষসমূহ, প্রণব রায় এবং তাঁর স্ত্রীর আবাস থেকে খানিক ব্যবধানে। শ্বশুর-শাশুড়ি এবং ছেলে-বৌয়ের নিভৃত অবস্থান বজায় রাখার জন্যই এই বন্দোবস্ত। রয় ম্যানসনের চারজন বাসিন্দা অবশ্য খাওয়া-দাওয়াটা নিয়মিত এক সঙ্গেই করেন ওঁদের কমন ডাইনিং রুমে।

হঠাৎ সুশান্তর ডাকে ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসে শর্মিলা বলল, "কি ব্যাপার? কখন ফিরলে তুমি? এখনো শুতে যাও নি"!

উত্তরে ধপ্ করে বিছানার ওপর, শর্মিলার পাশে বসে পড়ে সুশান্ত নিম্নস্বরে বলল, "চুপ, চুপ্। ধীরে কথা বলো। কেউ যেন শুনতে না পায়"।

– "এখানে আছেটা কে যে শুনতে পাবে?" বিস্মিত হয়ে বলল শর্মিলা।

– বলা যায় না। দেওয়ালেরও কান আছে।

– এমন কি সাংঘাতিক কথা বলতে এসেছ তুমি যা দেওয়ালের কান এড়িয়ে বলতে হবে?

– আমি বিপদে পড়েছি, শর্মিলা। খুব বিপদ।

চম্‌কে উঠে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল শর্মিলা।

– একটু আগেই ট্যামারিন্ড কোর্ট বারে গোলাগুলি চলেছে। তখন কাউন্টরের কাছেই আমি, নরেশ, মানব আর অজয় দাঁড়িয়েছিলাম সার্ভিসের অপেক্ষায়। হঠাৎ একটা লোক আমাদের ঠেলে সোজা কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর কথা নেই বার্ত্তা নেই, চক্ষের নিমেষে পিস্তল বার করে বারমেডকে গুলি করল।

– "তারপর"? অনেক কষ্টে কথাগুলো নির্গত হল শর্মিলার মুখ থেকে।

– গুলি খেয়ে বার মেড মেয়েটা মাটিতে পড়ে গেল আর যে লোকটা গুলি চালিয়েছিল সে বিদ্যুতের স্পীডে বাইরে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বারের মধ্যে কোলাহল, হৈ হৈ আর ছুটোছুটি পড়ে গেল।

বাক্‌রুদ্ধ শর্মিলা বিস্ফরিত চোখে চেয়ে রইল শুধু।

সুশান্তর হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। মেঝের ওপর ধপাস্ করে, একটা আলুর বস্তার মত সে বসে পড়ল। ওর সেই চাঞ্চল্য, আকাশে উড়ে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর সেই মুক্ত মন, সেই প্রাণশক্তি – তখন সম্পূর্ণ উবে গিয়েছে ওর দেহ মন থেকে।

– "এখন কি হবে, শর্মিলা? নরেশ আর অজয়কে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে। আমি আর মানব কোন রকমে বেরিয়ে পড়েছিলাম সবার চোখ এড়িয়ে। কি হবে নরেশ আর অজয়ের! কি করে বাঁচাব ওদের! কি ভাবে প্রমাণ করব যে আমি আর আমার বন্ধুরা নির্দোষ"! দুই হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সুশান্ত।

– "আর ইউ শিওর তোমাদের মধ্যে কেউ মেয়েটিকে গুলি করো নি"? হিমশীতল গলায় শর্মিলা প্রশ্ন করল।

– "আমাদের মধ্যে কেউ! আমি"! আহত কণ্ঠে শর্মিলার দিকে তাকিয়ে বলল সুশান্ত। রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ছে ওর দুই চোখ থেকে, "আমাকে তোমার সেরকম মনে হয়? আমি বন্দুক পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াই! আমার সম্বন্ধে এই ধারণা তোমার"?

– আমি বুঝতে পারি না তুমি এক্স্যাক্টলি কেমন! তবে তুমি না হলেও তোমার মাস্তান বন্ধুরা? তাদের মধ্যে থেকে হয়ত' কেউ –"!

– সত্যিই তো! "তুমি আর আমাকে চিনলে কোথায়? সে সুযোগ তো তোমাকে দিলামই না আমি। যাক্ গে, তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়ো"। সুশান্ত উঠে গেল স্টডিতে, তার নিজের শয্যায়।

পরের ছটা মাস সুশান্ত এবং তার পরিবারের ওপর দিয়ে তুমুল ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেল। পুলিশ, জেল, কোর্ট-কাছারি, এলিট সোসাইটিতে জ্বলে ওঠা গুজবের আগুন, সরকারী দপ্তর মহলের বড় বড় অফিসারদের নিয়ে নানা সমালোচনা, কেচ্ছা – অনেক কিছুরই সামনে দাঁড়াতে হল প্রণব রায়কে। এবং সুশান্তকেও। তবে আপ্রাণ চেষ্টায় শর্মিলাকে আড়াল করে রেখেছিল রয় পরিবার। স্ক্যান্ডলের আঁচ তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল।

তারপর হঠাৎ একদিন সুশান্ত উধাও হয়ে গেল। কেউ ওর হদিশ পেল না আর। শর্মিলার অনুমান, প্রণব রায় ওকে আমেরিকা পাচার করে দিয়েছেন, যথা জায়গায় প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে। শর্মিলাও অতঃপর শ্বশুরবাড়ির পাট চুকিয়ে আবার ওর বাবা-মায়ের কাছে ফিরে এলো।

(৮)

– হ্যালো মিসেস মুখার্জী, ওয়েলকম্ ব্যাক্ টু দ্য ক্যাম্পস্", কোথে'কে হঠাৎ পবিত্র যেন আবির্ভূত হল শ্রীতমার সুমুখে, "কবে এলি? কেমন আছিস"?

– ভাল আছি। আর তোরা ?

– এই যে, আবার নতুন করে লেখাপড়ার আখাড়ায় নামব বলে চলে এসেছি।

– জয়া কোথায় ?

– মনে আছে তাহলে জয়াকে ?

– মানে ? মনে থাকবে না কেন ?

– এই একমাস তো তোর কোন সাড়াশব্দই পাই নি আমরা, শ্রী। তুই কোলকাতা গিয়েছিলি না চন্দ্রলোকে বিচরণ করছিলি, বল্ তো? তারপর ওন্‌লি গড্ নোজ কবে ফিরেছিস কাশীতে; ফিরে আসার পরও খবর দিতে পারিস নি! আশ্চর্য!

– আচ্ছা বাবা, ঘাট হয়েছে। খুব অন্যায় হয়ে গ্যাছে। বল্ না, জয়া কোথায়"?

– আপাততঃ একটা লেক্‌চার অ্যাটেন্ড করছে। চলে আসবে ঘন্টাখানেকের মধ্যে।

ওরা কথা বলছিল স্টুডেন্ট্‌স্ ক্যান্টিনে বসে।

– কি লিখছিস আজকাল? তোর সাহিত্যচর্চা কেমন চলছে, পবিত্র?

– ভাল না। আপাততঃ এম.এ.র প্রথম সিমেস্টরের ধাক্কাটা কোন রকমে সামলাবার চেষ্টায় মন দিচ্ছি। লেখালেখি এখন বন্ধ।

– কেন? পড়াশোনায় তো তোর দারুন মাথা। অত চিন্তা করছিস কেন?

– "আমার এই অস্তিত্বটা তো ঠিক গোলাপ-শয্যায় শুয়ে কাটে নি। বরং জ্ঞান হয়ে অবধি অভাব দারিদ্রই দেখে এসেছি। জানিস তো, স্কলারশিপ ছাড়াও আমাকে কতগুলো ট্যুশন করতে হয় খরচ চালাবার জন্য? তাই ভাবছি –"

– চিন্তা করিস না রে, পবিত্র। আমি আর জয়া – আমরা তোর পাশে আছি তো।

– কিন্তু আমাকে যদি কোনদিন তোদের দয়ার পাত্র হতে হয়, সেটাই হবে আমার জীবনে সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের দিন। পরাজয়ের দিন।

– এরকম কেন বলছিস, পবিত্র? "তুই তাহলে এখনো আপন ভাবিস না আমাদের? এত বছরের বন্ধুত্বের পরও"?

– "ওই রহিমের দোহাটা মনে করে দ্যাখ্, শ্রী", পবিত্র বিষণ্ন হাসি হেসে বলল, "রহিমন উও নর মর গয়ে, যে কছু মাঁগন যাহি"। জগতে কারো কাছে কোনদিন হাত পেতে দাঁড়াবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়"।

– ছিঃ! এমন মর্বিড কথাবার্ত্তা বলছিস কেন আজ তুই! মোটেই ভাল লাগছে না"।

– ওই দ্যাখ্, জয়া এসে পড়েছে। এবার সত্যিই অন্য প্রসঙ্গে যেতে হয়। "জয়া তো আবার দুঃখ, দারিদ্র, অভাব-অনটনের প্রসঙ্গে যেতে চায় না। ওসব শুনলে নাকি ওর মাইগ্রেন হয়ে যায়"!

দুজনেই হেসে ফেলল। বিজয়া এসে পড়েছে ততক্ষণের ওদের টেবিলে।

কোলকাতা থেকে ফিরে এসে এক রবিবার সকালে সঞ্জয় আর শ্রীতমা দেখার করতে গেল গৌরীর সঙ্গে। মেয়ে-জামাইকে দেখে ভারি প্রীত হলেন গৌরী। ওদের আপ্যায়ন এবং ভাল-মন্দ রান্নাবান্না করে খাওয়ানোর মধ্যে কেটে গেল সারাদিন। এক সময়ে মেয়েকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন গৌরী, "কেমন কাটিয়ে এলি রে, শ্বশুরবাড়িতে? কোলকাতা কেমন লাগল"?

– "খুব ভাল, মা," মাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলল শ্রীতমা, "শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভালই। চয়ন-চন্দন যেমন বলেছিল "খুব খতরনাক" – সেরকম মোটেই না। কোলকাতা শহরের সব কিছুই আমাদের কাশীর থেকে পৃথক্। কিন্তু মা, তোমার জামাইটি সব চেয়ে ভাল। "বিয়ের আগে আমার মনের মধ্যে যত আশংকা, যত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল, সব কেটে গিয়েছে"।

গৌরী দেখলেন মেয়ে আনন্দের জোয়ারে ভাসছে। মনটা ভরে গেল তাঁর। প্রয়াত স্বামীর কথা স্মরণ করে দুই চোখে নেমে আসা অশ্রু, শ্রীতমাকে লুকিয়ে গোপনে মুছে ফেললেন তিনি।

* * * * *

নতুন সংসারে নিজেকে সুগৃহিণী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হল শ্রীতমা। ছুটির দিনগুলোতে খুব মন দিয়ে রান্না-বান্না করে। সঞ্জয় ভোজন-রসিক কোনদিন ছিল না। কিন্তু নববধূকে খুশী রাখার তাগিদে সে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে সচেষ্ট হয়। আবার, শ্রীতমাকে প্রায়ই মনে করিয়ে দিতেও ভোলে না যে এম.এ. পরীক্ষাতে খুব ভাল রেজাল্ট করা এবং স্বামীকে আদরে-সোহাগে ভরিয়ে রাখাটাই নাকি তার আসল প্রায়রিটি। রান্নাবান্না, বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা, সাজিয়ে রাখা – এসব অত্যন্ত লো প্রায়রিটি সঞ্জয়ের কাছে।

রাতের শয্যায় যখন গভীর উন্মাদনায় মেতে ওঠে ওদের যুগল দেহ, শ্রীতমা ভাবে, মনের মানুষের জন্য এত বছরের উন্মুখ অপেক্ষা তার সার্থক হয়েছে।

এদিকে সঞ্জয়ও আর সেই লাজুক, মুখচোরা মানুষটি নেই, যাকে একদিন শর্মিলা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এখন সে বোঝে, শর্মিলার মত একজন টগ্‌বগে, পূর্ণ যুবতীর দৈহিক মিলনে আগ্রহটা ছিল পুরোপুরি স্বাভাবিক। এবং সঞ্জয়ের বন্ধুরা – নীতিশ, বিনোদ, শ্যামল আর সিদ্ধার্থ – প্রত্যেকের সাড়া পেয়ে সে সাগ্রহে এগিয়ে গিয়েছিল। একমাত্র সঞ্জয় তার উন্মুখ আহ্বানে সাড়া দিতে পারে নি বলেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

গভীর অনুরাগ এবং কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সঞ্জয় দুই হাতে আঁকড়ে ধরে নবপরিণীতা স্ত্রীকে। উদ্দাম উল্লাসে নিষ্পেষিত করতে থাকে প্রতি রাতে। এক সময়ে পরম বাঞ্ছিত মুহূর্তটি অনুভব করে দুজনে এক সঙ্গে। কি স্বর্গীয় অথচ দেহপ্রাণ জোড়ানো সেই অনুভূতি, সেই শিহরণ! শ্রান্তিতে ওদের দুই চোখে ঘুম নেমে আসে অতঃপর।

আর এখন বিশ্বাস করে যে একটা ইন্‌ফ্যাচুয়েশন – ক্ষণস্থায়ী আসক্তি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না শর্মিলা তার জীবনে। তা নইলে, এত শীঘ্র শর্মিলাকে মুছে দিয়ে, শ্রীতমার ছবি কেন ফুটে উঠল ওর মনে! কেন সঞ্জয় প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রেয়সী শ্রীতমাকে চোখে হারায়।

শ্রীতমাকে পাগলের মত ভালবেসে সঞ্জয় এখন মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে যে দুটি মনের সাথে সাথে দুটি দেহের নিবিড়তা ব্যতীত বাস্তবিকই কোন প্রণয়-সম্পর্ক সম্পূর্ণ হয় না। হতে পারে না।

ইউনিভর্সিটি ক্যাম্‌পস্ থেকে কয়েক মিনিট দশেকের হাঁটাপথে সঞ্জয় আর শ্রীতমার ফ্ল্যাট। সকালবেলা দুজনেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ে নিজেদের গন্তব্য অভিমুখে। সারাদিন পর, সন্ধ্যা যখন নেমে আসব-আসব করে, ওরা দুজনে আবার একসঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফেরে।

এরই মধ্যে একদিন, সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে যখন ঢুকতে যাচ্ছে শ্রীতমা, হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনে থম্‌কে ফিরে তাকাল। রাজীব সান্যাল এগিয়ে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্! ইউ গট্ ম্যারেড অ্যান্ড ডিড্ নট ইভ্‌ন কেয়র টু ইন্‌ভাইট মী টু দ্য ওয়েডিং"? ওর মুখে দুষ্টুমির হাসি। অথচ চোখে ক্ষীণ বিষাদের ছায়া দেখতে পেল কি শ্রীতমা?

– "সরি, রাজীব। আই রিয়েলি অ্যাম সরি। আসলে বিয়ের ব্যাপারটা এমন হুট্ করে ঘটে গেল"! মুখ কাচুমাচু হরে বলল শ্রীতমা।

– "ঠিক আছে, ঠিক আছে। মাপ করে দিলাম। আচ্ছা আপনার সঙ্গে আজ কোন সময়ে কি ক্যান্টিনে দেখা হতে পারে? এই ধরুন পনেরো-মিনিটের জন্য। কয়েকটা কথা ছিল"।

– নিশ্চয়ই। হোয়াই নট্? লঞ্চ আওয়ারে দেখা করি তবে? একটা নাগাদ? ফ্রী আছেন তো আপনি?

– ঠিক আছে। একটার সময়ে তাহলে? ক্যান্টিনে?

শ্রীতমা ডিপার্টমেন্টে ঢুকে গেল।

বেলা একটার সময়ে ক্যান্টিনে এসে একটা টেবিলের সামনে মুখোমুখি হল ওরা।

শ্রীতমার দিকে মুগ্ধ চোখে চাইল রাজীব। মেয়েটা যেন বিয়ের পর আরও লাবণ্যময়ী হয়েছে। নতুন ভালবাসার স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে তাজা গোলাপের মত ফুটে উঠেছে।

চোখাচোখি হল দুজনের। শ্রীতমা ভাবল, রাজীব সান্যালকে আজ আরও ইম্প্রেসিভ লাগছে কেন! এর আগে লজ্জাবশতঃ কোনদিনই সে এমন পূর্ণদৃষ্টি মেলে তাকায় নি রাজীবের দিকে। আজ নিঃসঙ্কোচে দেখছে বলেই কি ওকে শ্রীতমার অন্য রকম লাগছে!

দুজনের জন্য কফি আর স্যান্ডউইচ অর্ডার দিল রাজীব। তারপর বলল, "শ্রীতমা, আমি এবার পি.এইচ.ডি. আরম্ভ করব"।

– ওহ্, দেখছেন, তালেগোলে ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি এম.এ. ফাইনালে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন এবছর! আপনার এই বিরাট সাফল্যের জন্য অভিনন্দন।

– ধন্যবাদ। পি.এইচ.ডি. ছাড়া আমার আর একটি প্ল্যানও আছে। আমি আই.এ. এস. পরীক্ষাতে বসব এবছর।

– "তাই"? গালে হাত দিয়ে বলল শ্রীতমা, "কেন বলুন তো? আপনার এমন ব্রিলিয়ন্ট করিয়র। ইউনিভর্সিটির অ্যাকাডেমিয়াতে আপনার জন্য উজ্জ্বল সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে। এসব ছেড়ে আপনি কি না অ্যাড্মিনিস্ট্রেটিভ সর্ভিসে যাবেন? ছোঃ"!

ওর কথার ভঙ্গীতে হেসে ফেলল রাজীব। তারপর বলল, "অ্যাকাডেমিয়া? নাঃ। অ্যাড্মিনিস্ট্রেটিভ এরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত যে ক্ষমতা, যে পাওয়ার – সেই পাওয়ার আমাকে অনেক বেশী আকর্ষণ করে"।

– ওহ্, অ্যাকাডেমিকের ইন্টেলেক্চুয়াল অর্থাৎ বুদ্ধিজীবি পাওয়ার বনাম অ্যাড্মিনিস্ট্রেটরের ডিপ্লোম্যাটিক আর রাজনৈতিক পাওয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপনি কি না পরেরটাই বেছে নিলেন। নাঃ! আপনি আমাকে নিরাশ করলেন, রাজীব।

– "আমি ক্ষমতা বুভুক্ষু মানুষ, শ্রীতমা", সকৌতূক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলল রাজীব, "ইন্ ফ্যাক্ট্ আমি পুলিশ বিভাগ জয়েন করতে চাই। বেশ কিছু ক্রিমিনাল আর করপ্ট লোকেদের সাফ করে, ভারতকে অন্ততঃ একটুও যদি পাপমুক্ত করতে পারি"। হো হো করে হেসে উঠল রাজীব। শ্রীতমাও যোগ দিল সেই হাসিতে।

– যাক্, আসল কথাটা বলি এবার। যে জন্য আপনার কাছ থেকে আজ একটু সময় চাওয়া।

শ্রীতমা উৎসুক নয়নে চেয়ে রইল।

– আমার কয়েকটা ভলেন্টিয়র কাজকর্ম থেকে এ বছরটা বিরতি নিচ্ছি আমি। আপনি যদি "গুঞ্জন"এর সম্পাদক-গ্রুপে আমার জায়গায় প্রক্সি দেন!

গুঞ্জন! শ্রীতমার অতিপ্রিয় পত্রিকা। বাছাই করা সব লেখা প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। শ্রীতমার ধারণা, "গুঞ্জন" ওদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গৌরব।

কিন্তু রাজীবের জায়গা ভলন্টিয়রি করতে গেলে তো আবার সেখানে সময় দিতে হবে বেশ খানিক। দিতে পারবে কি শ্রীতমা সেই অতিরিক্ত সময়! আর যদিও বা পারে, সঞ্জয় কি খুশী হবে তাতে! এমনিতেই শ্রীতমার পড়াশোনায় গাফিলতি করছে কি না, সে ব্যাপারে কড়া নজর সঞ্জয়ের!

– "কি ব্যাপার! কি ভাবছেন অত"? ওকে চুপ করে থাকতে দেখে রাজীব বলল, "আপনার হজ্‌বেন্ডের সম্মতি পাবেন কি না, তাই ভাবছেন বুঝি"?

– "হুঁ," সায় দিয়ে বলল শ্রীতমা, "এখন তো আমি আর একা নই যে নিজের ইচ্ছেয় চল্‌ব"।

– ঠিক কথা। "কিন্তু আপনার জীবনের সব ডিসিশন, মানে আপনার সমস্ত সংকল্প, সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তির জন্য আপনাকে স্বামীর পরামর্শ নিতে হবে, সেটা কি সত্যিই সম্ভব? না বাঞ্ছনীয়? আপনার নিজস্ব মতামত একেবারে বিসর্জন দিয়ে বসে থাকবেন"?

শ্রীতমা নীরব।

রাজীব আবার বলল, "দেখুন, পরিসর বলে একটা ব্যাপার আছে, মানেন তো? আমরা সকলেই সেই পরিসরের ছায়াটুকুর মধ্যে আবদ্ধ। নিজেদের নানা সম্পর্কের ধার্য সীমানার ছায়ায় থেকেই কাজ করে যাই সারা জীবন। সেটাই প্রকৃতির নিয়ম এবং বেঁচে থাকার একটা শর্ত। আপনার এবং আপনার স্বামীর মাঝেও তেমনি পরিসরের কতগুলো নির্দিষ্ট ছায়া আছে। নিজের সীমানার ছায়া লঙ্ঘন ক'রে আর কারও সীমানার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করবেন না। এবং তাঁকেও আপনার পরিসরের মধ্যে শুধু তাঁর স্থানটিতেই থাকতে দেবেন"।

নিঃশব্দে বসে রইল শ্রীতমা। রাজীবের কথাগুলোর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করছে সে।

এক সেকেন্ড সেদিকে চেয়ে রাজীব বলল, "ও. কে. তাহলে। কি ঠিক করলেন, যথাশীঘ্র জানিয়ে দেবেন আমাকে"।

মাথা নেড়ে সায় দিল শ্রীতমা।

– "ওহ্ হো, আর একটা খবর দিতে তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস, মনে পড়ে গেল," চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল রাজীব, "সামনের সপ্তাহে আমাদের ফ্যাকল্টি ডিবেটিং ক্লাবের উদ্বোধনী ডিবেট আরম্ভ হচ্ছে। এবার আমার টপিক "দ্য এথিক্‌স্ অফ্ ইন্টারভেন্‌শন্"।

– "এথিক্‌স্ অফ্ ইন্টারভেন্‌শন! মানে"? শ্রীতমা বলল।

– "আইডিয়াটা কিন্তু সত্যিই আকর্ষক এবং ফিলসফিকাল," রাজীব বলে চলল, "এখানে প্রথম প্রশ্ন হল যে একজন সভ্য সমাজের বাসিন্দা তার ব্যক্তিগত জীবনে অপরদের সাহায্য এবং সংরক্ষার ব্যাপারে যে সব নিয়ম মেনে চলে, সেই সমস্ত নিয়ম সমূহকে রাজনৈতিকেরা এবং মিলিটারির হত্তাকর্ত্তারা, আন্তর্জাতিক সংরক্ষণের সন্দর্ভে গাইডলাইন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে কি?

– দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, দৈবাৎ যদি সমাজে একজোট হয়ে থাকা মানুষজনের রক্ষার জন্য ব্যবহৃত নিয়মগুলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অচল হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে, যে কোন বিপন্ন পররাষ্ট্র সংরক্ষণের জন্য নতুন নিয়মাবলী তৈরি করা কি প্রয়োজন?

– আর সেই সঙ্গে আর একটি কথাও অবশ্যই চিন্তনীয়। কোন বিপন্ন রাষ্ট্রে, জন সংরক্ষণের জন্য আর একটি রাষ্ট্র যদি হস্তক্ষেপ করে, তাহলে সেই হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য এবং পরিণতির নৈতিকতার মধ্যে সন্তুলন কি ভাবে বজায় রাখা যায়।

– "আমি সপক্ষে বলব। আমার বিপরীতে অনীতা ধবন। পারলে আসবেন"।

চলে যেতে উদ্যত হয়েও একটু থমকাল রাজীব। দুষ্টু হেসে বলল, "সম্ভব হলে আপনার হজ্‌বেন্ডকেও ধরে নিয়ে আসবেন, কেমন"?

রাজীবের বিপরীতে এবার বলবে অনীতা ধবন! শ্রীতমা ব্যানার্জী নয়! ভাবতে ভাবতে অব্যক্ত একটা ব্যথা টের পেল সে বুকের এক কোণে।

* * * * *

অতি শৈশবে নিজের দীন দরিদ্র মা-বাবাকে হারিয়েছিল পবিত্র। ওর দায়িত্ব নিতে নিকট আত্মীয়রা কেউ এগিয়ে আসে নি তখন। শেষ অবধি কাশীর কোন অনাথ আশ্রমেই হয়ত' ঠাঁই হত পবিত্র রায়ের, যদি না ওর বাবার এক বন্ধু এসে ওকে দত্তক নিতেন।

বাবার সেই বন্ধু অত্যন্ত উদার হলেও, ধনী ছিলেন না। আসলে স্ত্রী আর তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি তখন নিজেই ছিলেন ন্যাজে-গোবরে। আর তাঁর সংসারটির অবস্থাও ছিল দারিদ্র নিপীড়িত। একটা প্রিন্টিং প্রেসে সামান্য চাকরি আর পার্ট-টাইম পুরুতগিরি করে কতই না আয় হত তাঁর। মাথা গোঁজার ঠাঁই অবশ্য একটা ছিল। তিলভান্ডেশ্বরের একটা সরু গলির মধ্যে, প্রায় একশ' বছরের প্রাচীন একখানা বাড়ি উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি পেয়েছিলেন। হোক্ না সে বাড়ি জরাজীর্ণ, চূণকামবিহীন, জায়গায় জায়গায় পলস্তরা-খসে-পড়া, কিন্তু তাও নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয় তো! তার ওপর দোতলা বাড়িটা নেহাৎ ছোট নয়। তাই, খানিক বড় হয়ে, ফ্রী স্কুলে ভর্ত্তি হবার কয়েক বছরের মধ্যে পবিত্রর তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পেয়ে ওর ধর্মপিতা ওকে গোটা একটা ঘরেই প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। পৃথক বিছানা, নড়বড়ে একটা পড়ার টেবিল এবং চেয়ার আর একটা টেবিল ল্যাম্প দিয়ে ঘরটাকে বাসযোগ্যও করে ফেললেন, যাতে সে নির্বিঘ্নে পড়ালেখাটা চালিয়ে যেতে পারে। নিজের গোটা একটা ঘর পেয়ে সদ্য কৈশোরে পা রাখা পবিত্রর মনে হয়েছিল সে যেন একটা রাজত্ব পেয়ে গিয়েছে। অতঃপর ধর্মপিতার মুখরক্ষা সে করেছিল। প্রতি বছর, প্রতিটি ক্লাসে এবং অবশেষে দ্বাদশ শ্রেণীতেও শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল পবিত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের ছাত্রবৃত্তি পেয়েছিল এবং তার সঙ্গে ট্যুশনও আরম্ভ করেছিল। নিজের খরচটুকু চালিয়ে যেটুকু অর্থ সঞ্চয় হ'ত, সবটাই তুলে দিত ধর্মমাতার হাতে।

খানিক বড় হয়ে নিজের সম্বন্ধে আর একটি তথ্য আবিষ্কার করল সে। মাঝে-মাঝে, কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ ওর চোখের সামনে ছবির মত ভেসে উঠত এক একটা দৃশ্য। ঠিক যেন স্টেজের ওপর চলমান নাটকের দৃশ্য, যার অভিনেতারা ওর পরিচিত। প্রথম দিকে হতবাক্ হয়ে যেত পবিত্র এবং আতঙ্কিতও। অথচ উপহাসের ভয়ে কারো কাছে কিছু বলতেও পারত না।

এক দিন, গঙ্গার তীরে এক সাধুকে দেখে ওর মনে হয়েছিল এঁকে বিশ্বাস করা যায়। সব কথা শুনে সাধু ওর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, "ঘবড়াও মত, বেটা। প্রভুজির আশীর্বাদে তুমি এই দূরদৃষ্টি পেয়েছ। এই ক্ষমতাকে তোমার অন্তরে লালন করো, হারিয়ে ফেলো না। আর, তোমার অর্জিত এই ক্ষমতার কথা কাউকে বলো না"।

অসহায়ভাবে মাথা নেড়েছিল পবিত্র। পরে, আর খানিক বড় হয়ে, ও বুঝেছিল এই প্রপঞ্চকেই পাশ্চাত্য জগতে বলা হয় এক্‌স্ট্রা সেন্‌সরি পরসেপ্‌শন্।

* * * * *

ইকনমিক্‌স্ বিভাগে একটা সেমিনারে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছে পবিত্র। ভারতীয় ইকনমির সন্দর্ভে সে কথা বলবে জনকল্যাণ-প্রণোদিত অর্থনীতির ওপর। সমকালীন ভারতে সর্ব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেশের যাবতীয় সঙ্গতি বিতরণ এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে মূল শিক্ষা প্রসারের আয়োজন কি ভাবে সম্ভব হতে পারে – এই নিয়েই পবিত্র তার বক্তব্য তৈরি করছে। যেন ঘোর তপস্যায় মগ্ন সে। আর কয়েকদিন পর তার সেমিনার।

হঠাৎ অতি প্রাচীন দেয়াল ঘড়িটা প্রহর ঘোষণা করল। চম্‌কে উঠে বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে তাকাল পবিত্র। এবং কথা নেই, বার্ত্তা নেই, ওর সুমুখের সাদা দেওয়ালটার ওপর একটা দৃশ্য ফুটে উঠল। অতীব লাস্যময়ী এক নারী। রুদ্ধ একটি ঘরের দরজায় সে মৃদু করাঘাত করছে। পরক্ষণেই, যেন ঘুমচোখে, দরজা খুলে বেরিয়ে এলো এক পুরুষ। মুহূর্তের মধ্যে, মোহিনী সেই নারী নাগিনী-কন্যার ভঙ্গীতে পুরুষকে গভীর আলিঙ্গনে বেষ্টন করল। চোখেমুখে তার ফুটে উঠল আদিম, অদম্য কাম-পিপাসা। অধীর আগ্রহে পুরুষটির মুখের কাছে নিজের মুখ নিয়ে গেল। তারপর সেই পুরুষের ঠোঁটে, ফুলের পাপড়ির মত নিজের অধর ঠেকিয়ে গভীর চুম্বনে লিপ্ত হয়ে পুরুষটির দেহ থেকে সমস্ত নির্যাস যেন শুষে নিতে থাকল সে। মোহিনীর বাহুপাশে নিষ্পেষিত হতে হতে, শ্বাসরুদ্ধ পুরুষটি ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। নিজেকে সেই নারীর কবল থেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টায় পুরুষটি তখন যুদ্ধরত। হঠাৎ এক সময়ে নিজেকে মুক্ত করে ছিটকে সরে দাঁড়াল সেই পুরুষ। আলো-আঁধারে ছায়ায় পবিত্র দেখল, পুরুষটি আসলে সঞ্জয়। দৃশ্যটাও শেষ হয়ে গেল সেখানেই।

চমক ভেঙ্গে জোরে মাথা নাড়ল পবিত্র। কি করে সম্ভব এটা! কোলকাতা থেকে ফিরে আসার পর শ্রীর সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে, পবিত্রর মনে হয়েছে, যেন প্রজাপতির ডানা মেলে এখুনি সে আকাশে উড়ে যাবে। সাবধানী, সতর্ক এবং মাঝে মাঝে নিজের ভবিষ্যত নিয়ে শংকিত শ্রীকে এমন আনন্দের বন্যায় ভাসতে কখনো দ্যাখে নি সে। এর আগে বার কতক ওর মনে হয়েছিল বটে যে শ্রী ওই সাহেবী চেহারার লোকটাকে বিয়ে করে ভুল করেছে কিন্তু ইদানীং শ্রীতমাকে দেখে ওর সেই সংশয় মুছে গিয়েছিল। তাহলে? কেন এরকম দৃশ্য দেখল সে?

"উফ্‌ আমি আধা-ঘুম এবং আধা-জাগরণের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম," পবিত্র নিজেকে বলল। অতঃপর সে খাতাপত্র বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল এবং অচিরেই ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল।

পরদিন বিকেলে ইউনিভর্সিটি ক্যাম্পাস থেকে পবিত্র আর বিজয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরল শ্রীতমারা। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে খানিক আড্ডা দিয়ে, বিজয়ার গাড়িতে করে ফিরে যাবে ওরা, এরকমটাই ঠিক করা ছিল।

ওদের তিনজনকে বসিয়ে সঞ্জয় কফি তৈরি করে আনল। সঙ্গে অতি সুস্বাদু কেক।

– বর তো তোর ওয়েল-ট্রেন্‌ড্‌, শ্রী। তোর জন্য রান্নাবান্নাও করে নাকি"? বিজয়া হাসতে হাসতে বলল।

– "তা অবশ্য করে," সগর্বে বলল শ্রীতমা, "সঞ্জয় মোটামুটি রান্না বান্না জানে। আর রান্না নিয়ে নানা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করতেও পছন্দ করে"।

– "তোমরা গল্প করো", সঞ্জয় বলল, "আমি বরং খাবারগুলো গরম করে টেবিলে রাখি"।

পবিত্র হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চলুন আমি আপনাকে সাহায্য করি। দুই মহিলা মনেপ্রাণের গল্প করুক ততক্ষণ"। রান্নাঘরে গিয়ে সঞ্জয় ফ্রিজ খুলে খাবার বার করতে তৎপর হল। পবিত্র কয়েক মুহূর্ত ওকে লক্ষ্য করে বলল, "সঞ্জয়দা, আপনি তো অনেক বছর অস্ট্রেলিয়াতে কাটিয়ে, বছর দুয়েক ভারতে ফিরেছেন, তাই না"?

– না, বছর দুয়েক নয়। তিন বছর, টু বী এক্‌স্যাক্‌ট্‌।

– "কেমন লাগছে এখানে? মানে প্রফেশনালি"

একটা কাঁচের ক্যাসরল ভর্ত্তি খাবার মাইক্রোওয়েভে গরম করতে দিল সঞ্জয়। ধীরেসুস্থে বলল, "হ্যাঁ, প্রফেশনের দিক থেকে এখানে অনেক কিছুই খুব অন্য রকম। মেনে নিয়ে অ্যাড্‌জস্ট করতে সময় লাগে"।

– তাহলে?

– তাহলে, আর কি?

– আপনি কি তাহলে সব মানিয়ে নিয়ে ভারতেই থেকে যাবেন? বিদেশে আর ফিরে যাবেন না?

– আপাততঃ আমার প্রায়রিটি এখানে থেকে শ্রীকে এম.এ.টা পাশ করানো। তারপর আমরা হয়ত' বিদেশে গিয়েই থাকব। অবশ্য শ্রী যদি রাজী হয় তাহলেই।

– শ্রী না চাইলে আপনি বিদেশে গিয়ে সেট্‌ল্ করবেন না?

– "নিশ্চয়ই না", সঞ্জয় টেবিলে গরম খাবার রাখতে রাখতে বলল, "বিয়ে যখন করেই ফেলেছি, ব্রাদার, তখন বৌটার দেখ-ভাল করাই আমার সব চেয়ে বড় কাজ। কর্তব্য এবং ভালবাসার দায় বুঝেছ? আগে বিয়ে করো, বৌকে মন-প্রাণ সঁপে দাও, তখন তুমিও বুঝতে পারবে।"

পবিত্র খানিক অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নাঃ! গতকাল যে দৃশ্যটা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, তার সঙ্গে তো কোন মিল নেই এই মানুষের মনোভাবে। মিথ্যেই ও ভয় পাচ্ছিল!

মুগের ডাল, ভাত, আলুপোস্ত আর কচি পাঁঠার ঝোল দিয়ে ডিনর সারতে সারতে টেবিলে আড্ডাটা ভাল জমে উঠল সেই সন্ধ্যায়।

– "এ সব রান্নাই কি তুই করছিস, শ্রী"? খেতে খেতে বিজয়া চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

– মাংসটা সঞ্জয় রান্না করেছে। আর ডাল এবং পোস্তটা আমি। আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে রান্না করি।

– "দারুণ হয়েছে মাংসের ঝোলটাও", বিজয়া আবার বলল, "সত্যি রে, তোদের দুজনের জবাব নেই। আমি তো চা আর অমলেট ছাড়া আর কিছুই বানাতে পারি না"।

– "সময় যখন আসবে ঠিক শিখে ফেলবি। চিন্তা নট", শ্রীতমা গালে হাত দিয়ে বলল।

– জানি না, শ্রী। আমি খুব একটা রান্নাবান্না, বাড়ির কাজে নাক গলাই না। ভাল্লাগে না।

– "কি ভাল লাগে তোমার, জয়া"? সঞ্জয় প্রশ্ন করল।

– আড্ডা দিয়ে, হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াতে। সিনেমা-থিয়েটার দেখতে। ট্র্যাভেল করতে।

– "কিন্তু লাইফ ইজ নট্ অল্ অ্যাবাউট আনন্দ, বন্ধু। নট ফর হাল্কা-ফুল্কা আনন্দ-ফুর্তির জন্য" শ্রীতমা হাসল।

– নাঃ! আমি একটা কেরিয়রেরও যেতে চাই।

– "কি হবে তোমার সেই কেরিয়ার? জানতে পারি কি"? সঞ্জয়ের প্রশ্ন।

– অবশ্যই। ফিলসফিতে পি.এইচ.ডি. করে আমি বিদেশে গিয়ে পোস্ট ডক্টোরল করার স্বপ্ন দেখি। সম্ভবতঃ আমেরিকায়?

– "বাঃ! সেটা খুব ভাল প্ল্যান," সঞ্জয় খুশী হয়ে বলল, "আমার পুরোপুরি সমর্থন আছে তোমার এই প্ল্যানে"।

– "কিন্তু বিয়ে-থা?" শ্রীতমা খাওয়া থামিয়ে বলল, "বিয়ে করবি না তুই"?

– আপাততঃ বিয়ে নামে ঝঞ্ঝাটটার কথা মোটেই ভাবি না আমি।

– "বাঃ! বিয়ে একটা ঝঞ্ঝাট"! আহত গলায় বলল শ্রীতমা।

– আমার তো তাই মনে হয়, শ্রী। চারিদিক থেকে যে খবর পাই আর দেখি! বিয়ের ব্যাপারে ভরসা আমার খুব কম। অবশ্য তোর কেসটা একটা ব্যাতিক্রম। সবার ক্ষেত্রে তো এরকমটা হয় না।

খাওয়া-দাওয়ার পর সঞ্জয় ওদের আমের কুল্পী সার্ভ করল। সঙ্গে গরম কফি।

বেশ খানিকক্ষণ ব্রিজ খেলা চলল অতঃপর। এক সময়ে হাতঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল পবিত্র। রাত বারোটা! ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল সে। বিজয়াও ওর সঙ্গে উঠতে উঠতে বলল, "অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমি তো তোকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরব। চিন্তা করিস না"।

গাড়িতে উঠে চালকের সীটে বসল বিজয়া। পাশে পবিত্র।

– "তুই যেন আজ একটু চুপ্‌চাপ পবিত্র? রোজকার মত কল-কোলাহল করছিস না তো!" গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বিজয়া বলল।

– পরশুর সেমিনারে আমার প্রেজেন্টশন নিয়ে একটু ভাবনা-চিন্তা করছি।

– ধুস্। "এই যেন প্রথম সেমিনার দিচ্ছিস তুই! ছাড় তো", তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল বিজয়া।

কয়েক মিনিট চুপ করে থাকল বিজয়া। তারপর আবার বলল, "শ্রীকে তো খুব হাসিখুশীই দেখছি রে পবিত্র। তুই যে তার বিয়ের আগেই ভবিষ্যতবানী করেছিলি, ও সুখী হবে না? দেখলি তো তোর কথা সব ভুয়ো বেরোল"।

– আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। ওটা ভুয়োই ছিল। থ্যাংক গড্।

– যা বাব্বাঃ! ওরা দুজনে খুশীমনে ঘরকন্না করছে দেখে এখন আমি অনেক নিশ্চিন্ত।

– "হুম্!" পবিত্র বলল।

পবিত্র তখন ভাবছে। মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ যেন অস্থির হয়ে উঠেছে কয়েকটা না-পাওয়া উত্তরের প্রত্যাশায়।

সে ভাবছে তার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কথা। সাধুবাবা বলেছিলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদেই নাকি সে পেয়েছে এই আশ্চর্য ক্ষমতা। কিন্তু বাস্তবিকই কি এই ক্ষমতা তার জীবনে আশীর্বাদ? না কি একটা অভিশাপ? অভিশাপ যদি না হবে তাহলে নীরব দর্শকের ভূমিকায় বসে, সে আগামী দিনগুলোর যে টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি দেখতে পায়, তার প্রতিকার করার ক্ষমতা ওর নেই কেন? এবং কেনই বা পবিত্র নিজে তার ভবিষ্যতের একটিও মুহূর্তের মুখোমুখি হয় না?

আর বিজয়ার যদি সত্যিই এবার বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে পবিত্র তার বন্ধু-শূন্য জীবন নিয়ে কি করে কাটাবে? সেই কোন্ বাল্যকালে গানের স্কুলে বিজয়ার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পবিত্রর। বিজয়া গান শিখত আর পবিত্র গীটার। এখন সে যদি ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়!

এধরনের চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে, পবিত্র বোঝাল নিজের মনকে। এ জগতে প্রতিটি মানুষেরই তো একক যাত্রা। একা আসা। যাত্রার শুরুও একা। আবার, যাত্রার শেষে একাই ফিরে যাওয়া অজানা, অনিশ্চিত কোন পরিণতির দিকে।

শুধু জীবনযাত্রায় চলাকালীনই যা সহযাত্রীদের সঙ্গে পরিচয়, অন্তরঙ্গতা এবং কিছুটা পথ একসঙ্গে হেঁটে চলা। তার বেশী তো আর কিছু না। তাহলে, জয়া তার যাত্রার পথে পৃথক মোড় নেবে ভেবে কেন ওর মনে এই অস্থিরতা!

– কি হল? এক্কেবারে গুম্ মেরে গেলি যে", ওকে জোরে এক ধাক্কা দিল বিজয়া।

– "কি বলছিস, বল্", চম্‌কে উঠে নড়েচড়ে বসল পবিত্র।

– বলছিলাম তো অনেক কিছুই, কিন্তু তোর কানে গেল কি?

– "সরি, জয়া", একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কি বল্‌ছিলি, বল্। খুব মন দিয়ে শুনব। প্রমিস।

– বলছিলাম, তোর প্রেসেন্টেশন হয়ে গেলে চল্ আমরা দুজন একটা উইকেন্ডে আবার সারণাথ চলে যাই। একটু বেশী সময় নিয়ে, ভালভাবে ম্যুজিয়মটা দেখে আসি।

– সারণাথ! শুধু আমরা দুজনে?

– আহা, আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে পড়লি যেন! কেন, আমার সঙ্গে একা যেতে বাধা কি তোর?

– না, মানে – শ্রী আর সঞ্জয়দাকেও –

– একদম না। কপোত-কপোতীকে ওদের মনেই থাকতে দে। আমার সঙ্গে যদি তোর চলতে আপত্তি না থাকে, তাহলে আমরা দুজনেই যাব।

– ঠিক আছে, যাব'খন।

* * * * *

(চলবে)

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায় – জন্ম বারাণসী শহরে। দীর্ঘকাল মেলবোর্ণ শহরের বাসিন্দা। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ.। মেলবোর্ণের মনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটর সায়েন্সে ডিপ্লোমা। বিভিন্ন সরকারী রিসার্চ বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন। দেশ, সানন্দা, আনন্দবাজার পত্রিকা, নবকল্লোল এবং বর্তমান সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা। উপন্যাস এবং ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে শারদীয় দেশ, সানন্দা ও আনন্দলোকে। অবসর সময়ে বই পড়তে ভালবাসেন। ভালবাসেন ভ্রমণ। ছন্দসীর প্রকাশিত গ্রন্থ – অভিযান (আনন্দ), মায়াজাল (আনন্দ), ছায়া পরিসর (লাল মাটি প্রকাশন), নির্বাচিত গল্প প্রথম ভাগ (দাশগুপ্ত পাব্লিশার্স) এবং Seven Favourite Stories – translation of seven short stories by Sirshendu Mukhopadhyay (Dasgupta Publishers)। ওয়েব সাইট : www.bando.com.au

ধারাবাহিক

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

চল নিধুবনে

পর্ব ৫

সরস্বতী পুজোয় হাজারটা ঝামেলা থাকে, তার মধ্যে আবার এবছর পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা মীরা নেই। চিত্রা কোন কাজেই হাত লাগাবে না বলে দিয়েছে। হেনা খুব চিন্তা করছিলেন। মাঝেমাঝে একথাও ভাবছিলেন, তবে কী তাদেরই ভুল। পুজো করার সিদ্ধান্ত না নিলেই ঠিক হত? কিন্তু পুজোর প্রাঙ্গণে পৌঁছে তার মন ভরে গেল। শরীর কদিন হল ভাল যাচ্ছেনা। তবু গোছানো পুষ্পপাত্র, কাটাফলে যথাযথ সাজানো পুজোর নৈবেদ্যর থালা দেখে মনে আর কোন আক্ষেপ রইল না। সব গোছগাছই ওরা ঠিকঠাক করেছে। ঠিক যেমন মীরা করত। তারমানে মীরা ওদেরও ত্রৈ করে দিয়ে গিয়েছে। তবে সব ছাপিয়ে গিয়েছে মায়ের মূর্তি। লাবনীর হাতে গড়া মূর্তির কোন তুলনাই হবেনা। সবাই হয়ত তারই জন্য অপেক্ষা করছে। ধীর ভঙ্গিতে গিয়ে হেনা পুজোর আসনে বসে পড়েন।

ঝুমুর একদিকে বসে চন্দন বাটছিল। হেনাদি পুজোর আসনে বসে পড়তেই বাটা থামিয়ে কিছুটা চন্দন দিয়ে চন্দন পাত্র এগিয়ে দেয়।

হেনা বলেন, "থাক থাক, যা হয়েছে ওতেই হয়ে যাবে। তুমি উঠে পড়ো।"

ঝুমুর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সবার নজর পড়ে ওর দিকে। ছিপছিপে লম্বা, ফর্সা শরীরে, পুরনো সালোয়ার কামিজটা বড় বেমানান। একেবারেই মানাচ্ছে না। টিকালো নাকে একটা সোনার নাকছাবি আর কানে দুটো সোনার মাকড়ি ছাড়া কোন আভরণ নেই। ভেজা চুল থেকে জলের ফোঁটা গড়াচ্ছে। ঝুমুর একপাশে স্থির দাঁড়িয়ে আছে এখনও। হেনা ওর দিকে তাকিয়ে চোখের ইসারায় বসতে বলেন ওকে। মেয়েটাকে একটা সালোয়ার কামিজ কিনে দেবেন। ওকে দিলে মনুয়াকেও দেবেন। নবীনাকে দিয়ে আনাবেন, মনেমনে ভাবেন তিনি। মনুয়া ধুনোটাকে জ্বালাচ্ছে এখনও। ওরা ছাড়া পুজোর জায়গায় ধারে কাছে আর কেউ নেই। সবাই একটু দূরেই অপেক্ষা করছে। হেনা ফিস্‌ফিসিয়ে মনুয়াকে বলেন, "চিত্রার খোঁজটা একবার নিয়ে আসবে? এখনও এল না। শরীরখারাপ হল কিনা কে জানে?

এবারে মীরা নেই। তাই সরস্বতীর বন্দনা পাঠের কাজ হেনাই করবেন। প্রসাদ বিতরণের পর সাহিত্যিক তপনতনুর সাহিত্য পাঠ করার কথা। শুধু খিচুড়ি খাওয়া হবেনা। মীরার জন্য ওই আনন্দ অনুষ্ঠান তারা এবছর বাতিল করেছেন। শান্ত আসেননি এখনও, সেটাও হয়না কোনওবার। সবাই সেটা নিয়েও ভাবছে।

সময় কারো জন্য থেমে থাকে না। পুজো তো পরে করলে চলবে না। তাই ইচ্ছে না থাকলেও সরস্বতীর বন্দনার পাতাটা উলটে বার করলেন তিনি। ঠিক তখনই মনুয়া এসে হাজির হল। পেছন পেছন চিত্রা। বই খুলে বন্দনাগীতির সুর ধরতে না ধরতেই শান্তর গাড়ির আওয়াজ কানে এল।

ঝুমুরের মনখারাপ হচ্ছিল। অত করে বলে দেওয়া সত্ত্বেও নবীনাদি এলেন না। ভোর থেকে ও প্রতীক্ষায় ছিল। নবীনাদি এলে মায়ের খবরও পাওয়া যায়। পুজোর ফলপ্রসাদ বিতরণ করছেন চিত্রাদি। উনি একবার হাতছানি দিয়ে ডাকলেন ওকে।

নিচু গলায় বললেন, "ঝুমুর তোমাকে একটু বেশি করে ফল দিচ্ছি। তুমি, মনুয়া নিয়ে বাকিটা ওই ছেলেটাকে দিয়ে দিও। ওর জন্য সবার সামনে তো আলাদা করে কিছু দেওয়া যাবে না।"

ঝুমুর অবাক হয়ে তাকায়। উনি হাসেন, "আমি জানি। ভুষণকে শান্ত বলে রেখেছে, এ বাড়িতে যা যা হবে সব আমাকে আর হেনাদিকে জানাতে।"

চিত্রা আসায় মনটা খুব ভাল লাগছিল হেনার। আসলে মীরা না থাকায় পুজোর সুর তাল একটু হলেও কেটেছে। বন্দনা পাঠ মীরা ভজন দিয়ে শুরু করে। এবারে বাসন্তীকে বলেছিলেন ভজন করতে। বাসন্তী বলল, "ওই আসন মীরাদির জন্য সংরক্ষিত। ওখানে আমি বসি কিকরে ? বরং পুজো শেষে আমি সরস্বতী বন্দনা করে দেব।" সে গান শুনেছেন তারা। ও বড় গায়িকা। খুব ভাল গাইল। কিন্তু তবু বারবার মীরার গলা কানের কাছে বাজছিল। মীরা তো গায় না। ও পুজো করে।

প্রতিবার হেনা খিচুড়ি রাঁধেন, একটা পাঁচমিশালি তরকারি হয়। আর চাটনি, বেগুন ভাজা, শেষপাতে শান্তর শহর থেকে আনা বোঁদে দিয়ে জমে যায় খাওয়াটা। কিন্তু এবারে তাদের কারোরই ভাল লাগছে না। মীরা কথা বলত কম। সবসময় নিজের ঘোরে থাকত। ওর গানই ছিল ওর অস্তিত্ব। ওর হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভাল লাগার সুরটাই হারিয়ে গিয়েছে আরশিনগর থেকে। তারা যখন প্রথম এখানে থাকতে আসেন, ফাঁকা বাড়িগুলো গিলতে আসত। যেকোন সময় বিপদ আসতে পারত। তবু ভয় পাননি তারা। ভাবতেন যা হবার হবে। তারপরে কোনওভাবে শান্ত এলো। বাসন্তী, মণিকুন্তলা, তপনতনু এরা পরপর এসেছে। মীরা এসেছে অনেক পরে। সবার বাড়ি তারা ঠিক করে দিয়েছেন। বিপদে আপদে একভাবে থাকতে থাকতে ভুলে গেছিলেন এসব ছাড়তে হবে। যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে। মীরা যেন সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

সব মিটে যাবার পর বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন তিনি আর চিত্রা। হঠাৎ আওয়াজ শুনে পেছন ফিরে দেখেন ঝুমুর আর মনুয়া তাদের পেছনেই দৌড়তে দৌড়তে আসছে। তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন । ঝুমুর একটু এগিয়ে এসে বলল, "আজ দুপুরে হেনাদি আপনি আর চিত্রাদি আমাদের ওখানে খাবেন। শান্তদাকেও বলেছি। ভূষণদা খিচুড়ি রাঁধবে ঠিক হয়েছে।"

"ওমা সেকি, তোমরা ছেলেমানুষ আমাদের খেতে বলছ কেন ? কোথায় আমরা খাওয়াব। তা নয়, এসব খেয়াল ছাড়ো।"

মনুয়া এগিয়ে এসে বলে, "আমরা এগোই। ভূষণদাকে সাহায্য করতে হবে তো। সময়মত এসে যাবেন। আপনারা না আসা অবধি আমরা বসে থাকব। তাহলে এগোই, ঝুমুর চলে আয়।"

ওরা চলে যেতে হেনা চিত্রার দিকে তাকান, তারপর দুজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেন।

রান্নার কাজে ঝুমুর তেমন দক্ষ নয় বলে মনুয়া ওকে এদিকে ঘেঁসতে দেয়নি। নিজেদের ফল গোছাচ্ছিল ঝুমুর। একটা মোটে খেঁজুর আছে। কি ভেবে ও ছেলেটার ডিসে খেঁজুরটা গুছিয়ে দেয়। মনুয়া এদিকেই তাকিয়ে ছিল, বলে, "খেঁজুর কোথায় দিলি? একটাই আছে তো, আমাকে দে। সাধে কি বলেছি 'জামাইবাবু'?"

ঝুমুরের রাগ হয়ে যায়। "খালি বাজে কথা। তুই গুছিয়ে দে। আমি পারবনা।"

ঝুমুরের আসলে লজ্জা করছিল। গতকাল মনুয়া শুকনো কাঠ আনতে জঙ্গলে গিয়েছিল। ভূষণদা খেয়ে উঠে রোজ শমীক নামের ছেলেটাকে খাবার দিয়ে আসে। বাসন্তীবালা ওকে কিছু জিনিস আনতে দিয়েছিলেন। ও নদী পেরিয়ে ওই ছোট শহরটায় গিয়ে ফেরেনি তখনও। ছেলেটার খাবার দিতে দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে, দরজা ভেজিয়ে ও গিয়েছিল সেসব দিতে। বাড়ির পেছনের রাস্তাটায় তেমন ঘোরপ্যাঁচ নেই। পৌঁছে যায় সময়মত। কিন্তু তারপরেই গোলমালের সূত্রপাত।

ও গিয়ে দরজা নক্ করতেই দরজা খুলে দেয় ছেলেটা আর অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "আপনি ?" বলেই একছুটে ঘরে চলে যায়। খালি গা, কোমরে একটা ছোট গামছা জড়ানো, বোধহয় বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। তবু ওরই মধ্যে ওকে বসতে বলেছিল। ঝুমুর অবশ্য বসেনি। দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল।

ছেলেটা পোশাক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। স্নান সারা চুলে কপালের বেশিটাই ঢাকা পড়েছে। ফর্সা রঙের জেল্লাটা ধরা দিয়েছে চোখেমুখে। ছেলেটা ওর দিকে হাত বাড়িয়ে খাবার নিতে নিতে সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, "আপনাদের খুব জ্বালাচ্ছি। দেখি একটু সুযোগ পেলেই চলে যাব।"

জবাবে ঝুমুর বলেছিল, "না না সে কি ? শান্তদার সঙ্গে দেখা না করে যাবেন কেন ? আমাদের কোনও অসুবিধা হয়নি ।"

"হয়নি না হচ্ছে, তা একটু বুদ্ধি থাকলেই বোঝা যায় । ও হ্যাঁ,বাগানে প্রচুর পাতিলেবু ছিল । আমি পেড়ে রেখেছি । যাবার সময় ওই টেবিল থেকে নিয়ে যাবেন ।" ওর এত লজ্জা করছিল আর দাঁড়ায়নি । লেবু নিয়েই পালিয়ে এসেছে ।"

শমীক পিছন থেকে বলেছিল, "বাসনগুলো ধুয়ে রাখতে হবে, ওসব আমি ধুয়ে রেখে দেব । ভূষণদা এলে পাঠিয়ে দেবেন । নিয়ে যাবে ।"

এ তো দিব্যি কথা বলে! আহত হয়ে অতগুলো দিন ওদের বাড়িতে ছিল, একটা কথা বলেনি । ঝুমুর তারপর থেকে আনমনে আছে । কী যে ভাবছে,ও নিজেই জানে না । তবে মাঝেমাঝে ছেলেটার চোখদুটো ওর মনে পড়ছে । ওর দিকে কেমন সহজ চোখে তাকিয়েছিল । না । ও এসব কিছুই মনুয়াকে বলেনি । মনুয়া জানতে ও চায়নি । শুধু বলেছিল, "এত পাতিলেবু কোথা থেকে এল ?" ও কোন জবাব দেয়নি ।

সেদিন মনুয়া শুকনো কাঠের বান্ডিল বেঁধে বাড়ির দিকে টেনে এনেছিল । ও একা কোনদিন বনে ঢোকেনা । ঝুমুরকে নিয়ে আসে । একাই গিয়েছিল । আসলে ওর খুব কৌতূহল হয়েছিল । সত্যিই কি ওই জলপাই রঙের পোশাক পরা মানুষগুলো চলে গিয়েছে ? না আছে ? নানান ঝামেলায় ওদের কাঠ যোগাড় করতে বনে ঢোকা হয়নি । একবার যখন ঢুকেছে, ও দেখে নেবে ঠিক ।

বনের মধ্যে একটা বড় পেয়ারা গাছ আছে । ওই গাছটায় চড়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয় । শুকনো কাঠের টুকরোগুলো জড়ো করে ও বেঁধে ফেলেছিল । তারপর গাছে উঠেছিল । ঝুমুর থাকলে নির্ঘাৎ বাধা দিত । এত সহজে ও গাছে উঠতে পারত না ।

একটু উঁচুতে উঠে ও দেখছিল । না কোথাও কিছু নেই । তবে বনের দক্ষিণ দিকে ধোঁয়া উঠছে । ওই দিকেই ওরা আছে মনেহয় । দেখেশুনে ওর নামার পালা । কিন্তু নামতে পারল না । দুটো লোক এদিকেই আসছিল । শুধু তাদের পায়ের আর কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল মনুয়া । পাতার আড়ালে যতটা পারে নিজেকে ঢুকিয়ে রেখে বসে ছিল তখন ।

দুটো লোক, ওর সামনেই পেয়ারা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পড়ল । ওরা কথা বলছিল । ওদের গায়ে সেই জলপাই রঙের পোশাক । মনুয়া স্থির হয়ে বসে ভাবছিল, এত তাড়াহুড়োর কী ছিল ? ওরই বুদ্ধির দোষ । জলখাবারটা খেয়ে এলে এত খিদে পেতনা । এখন কতক্ষণ এখানে বসে থাকতে হবে কে জানে ?

লোকগুলোর মুখে গামছা বাঁধা । সতর্ক ভঙ্গিতে ওরা কিছু খুঁজছিল । কিংবা হয়ত কিছুই না । ওরা এপাশে ওপাশে দেখছিল কাউকে দেখতে পায় কিনা । গাছের চারপাশে গোল করে ঘুরে ওরা চলে গেল । মনুয়া নামেনি । ও গাছ থেকেই নজর রাখছিল । ওরা অদৃশ্য হতে ও নেমেই কাঠ নিয়ে দৌড়েছিল । বাড়ি এসে ও অবাক হয়ে দেখেছিল, দরজা ভেজানো, ঝুমুর বা ভূষণদা কারো টিকির দেখা নেই । ওরা কেউ বাড়িতে ছিলনা । কিছু পরেই ফিরেছিল ঝুমুর । কোনকথা না বলে স্নান করতে চলে গিয়েছিল মনুয়া । সেদিন ঝুমুরকে লক্ষ্য করেই ও বুঝেছে একটা প্রজাপতি এসে বসেছে ওদের ঘরে । বন থেকে উড়ে আসা প্রজাপতির স্বপ্ন ঝুমুরের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল ও । ঝুমুরকে কিছু বলেনি । ভয় পেয়ে ডানা মেলে ওটা উড়ে যায় যদি ।

আজ সরস্বতী পুজোর দিন হেনাদি, চিত্রাদি, শান্তদা ওদের বাড়িতে খেতে আসবেন । জমিয়ে রাখা একটা বাঁধাকপি, কিছু টমেটো নিয়ে কাটতে বসেছিল ঝুমুর ।

ঝুমুরের খুব ইচ্ছে করছিল আজ ও রাঁধবে। কিন্তু মনুয়া ওকে রাঁধতে দেবেনা। বলেছে খিচুড়ি রাঁধবে ভূষণদা আর তরকারি, চাটনি আমি রাঁধব। তুই আগে খুন্তি ধরতে শেখ ভালো করে। তারপরে রান্না করতে দেব। আলুভাজাটাও করতে দিলনা।

শান্তদা নাকি বলেছে "আজ সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাব। ওই শমীককেও ডেকে এনো ভূষণ। সামনা সামনি কথা হয়ে যাবে।"

সকাল থেকে ঝুমুরের একতারায় একটা গানই বাজছে, "ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।" ও গাইছে না। গাইলেই মনুয়া আওয়াজ দেবে। তবে মনের মধ্যে একতারাটা বেজেই চলেছে। শমীকের মুখ কেন সারাক্ষণ ওর চোখের সামনে ভাসে কে জানে?

কুটনো কুটতে কুটতে ওর হঠাৎ ভয় হল। শমীক যদি না আসে ? যদি ভয় পায়। আলু ছাড়াতে ছাড়াতে ও গুনছিল, "আসবে", "আসবে না"। "আসবে", "আসবে না"। দশে এসে "আসবে না" হওয়ায় মন খারাপ হয়ে গেল খুব।

মনুয়া দেখছিল ঝুমুরকে। কী যেন হয়েছে মেয়েটার। সারাক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে আছে। একটা কথাও বলছে না। কখন থেকে একটা আলু ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হাত চলছে না মোটে। এভাবে হলে কীকরে হবে?

মনুয়া জোরে হাঁক দেয়, "কিরে ?"

ঝুমুর চমকে ওঠে।

"শকুন্তলা হয়ে গেলি নাকি ? বঁটিটা দে। আমিই কেটে নিই। রান্না চড়াব কখন ?"

ঝুমুর লজ্জা পেয়ে হাসে। "দিচ্ছি। এক্ষুণি হয়ে যাবে।"

মনুয়া বলে, "ভূষণদা কোথায় গেল বলতো ? খিচুড়ি না বসালে হবে কীকরে ?"

ওর কথা শেষ হবার আগেই বড় একটা হাঁড়ি আর ভাঁজ করা কলাপাতা নিয়ে ভূষণ ঢোকে। "তোমাদের যেমন বুদ্ধি! ওই ডেকচিতে এতজনের খিচুড়ি হয় ? বড় হাঁড়ি হেনাদির বাড়ি থেকে নিয়ে এলাম। কাঠের আঁচে ওই উঠোনের এক কোণে বসিয়ে দিচ্ছি। টগবগ করে ফুটলেই হয়ে যাবে। বেশি সময় লাগবে না। অমনি জঙ্গল থেকে খানকতক কলাপাতাও কেটে নিয়ে এলাম। কি ? ভাল করিনি ?"

রান্না তখন প্রায় হয়ে এসেছে, দরজায় কড়া নাড়াল কেউ। খুব একটা জোরে নয়। এসময় আবার কে এল ? শান্তদা, হেনাদি, চিত্রাদি তো আগেই এসেছেন। খেতে দেওয়ার সময় হলে, শমীককে ভূষণদা সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন যে, সেকথাও হয়ে গিয়েছে। তাহলে ? শান্তদা বললেন, "আমি দেখছি।"

দরজা খুলতেই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল নবীনা। ওর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে আছে। ওকে দেখে ঝুমুর ছুটে আসে। একগাল হেসে ও হাত ধরে নবীনার, "নবীনাদি, এসেছ ?"

নবীনা উত্তর দেয়না। গায়ের চাদর খুলে ধপ্ করে বসে পড়ে উঠোনের রকে।

"তোমার মুখটা এমন দেখাচ্ছে কেন ? কী হয়েছে ?" চিত্রাদি জানতে চান।

"ঝুমুর, একগ্লাস জল নিয়ে এসো। নবীনা, জল খেয়ে একটু ঠান্ডা হও। তারপর তোমার কথা শুনছি।" শান্তদা ভারী গলায় বলেন।

একগ্লাস জল আর সকালের অবশিষ্ট পুজোর প্রসাদ নিয়ে এগিয়ে আসে ঝুমুর। একটা বাতাসা ডিস থেকে তুলে নিয়ে নবীনা ঢকঢক করে জল খায়।

এত কান্ড ঘটে যাচ্ছে ভূষণদ্রা বিকার নেই। হাঁড়িতে হাতা ঘোরাতেই ব্যস্ত। মনুয়া আবার স্নানে ঢুকেছে।ও এক্ষুণি বেরোবে না। ঝুমুর দেখে এই ঠান্ডাতেও নবীনাদির গাল বেয়ে ঘামের জল গড়াচ্ছে। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে ঘাড় গলা মুছছে নবীনা।

ঝুমুর ধন্দে পড়ে। কী ঘটল আবার ? নবীনাদিকে এমন নার্ভাস লাগছে কেন?

# #

ঠাকুর বাড়ির প্রাঙ্গণে ঠাকুরের সামনে একা বসেছিল শালিনী। ঠান্ডা একটা হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টি হলেও হতে পারে। এরকম খোলা জায়গায় বৃষ্টি হলে কী হবে ? ঠাকুরের মাথায় শুধুমাত্র একটা চাঁদোয়া। ঠাকুর ভিজে যাবেন তো।

কথাটা লাইব্রেরির পুজোর মিটিংএ তুলেছিল ও। তখন সিদ্ধান্ত হয় বৃষ্টি হলে ঠাকুরকে তুলে নিয়ে আসা হবে যেকোনও বাড়িতে। আজ সরস্বতী পুজোর কোনকাজেই মন দিতে পারেনি শালিনী। বারবার ওর পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছিল। ওর নিজের নাচের স্কুলে এইদিনে বিশাল উৎসব হত। পুজোর সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, নাচ গান কিছুই বাকি থাকত না। এখানে শান্তদা ছাড়া সেসব কথা কেউ জানেনা। ওর পুরনো পরিচিতি কাউকেই জানায়নি ও। ডঃ রায়ও ওর বৃত্তান্ত জানেন না কিছুই। ও আরশিনগরে আসার বেশ কিছুদিন পরে ডাক্তার রায় এখানে একেবারে চলে আসেন। হেনাদিদের কাছে ও শোনে একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে উনি এখানেই থাকবেন বলে মনস্থ করেছেন। ওনার মেয়ে হারানোর কথাটা আবার যাচাই করেছিল ও। এমনও হয়। ভগবান আছেন তাহলে। পরে নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে নিজেই দোষারোপ করেছে। ছি ছি! এত ছোট কথা ও ভাবল কী করে?

আসল কথাটা হল, একথাই যদি ভাববে, সব ছেড়েছুড়ে ও চলে এল কেন ? অত বড় স্কুল, অত ছাত্রছাত্রী, সব ছেড়ে ...। টাকাপয়সার অভাব তো ছিলনা। দিনের পর দিন দেশে বিদেশে নিজের নাচের দল নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, হাততালির মোহ, স্তাবকের স্তাবকতা, সব ছেড়ে কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়া তো সোজা কথা নয়। কিন্তু ও ভোলে কীকরে ওর সব সর্বনাশের পেছনে ওই সুরঙ্গমা!

মাঝেমাঝে মনে হয়, ভুল ওর সব ভাবনাতেই। সুনীল যদি সুরঙ্গমার সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ত, ওকে নিয়ে প্যারিসে স্থায়ীভাবে থাকতে চলে না যেত, ওর চোখের ঠুলি খুলত কী ? ও একটা চোখ বাঁধা বলদের মত সারাজীবন ওই লোকটার পেছনে সব আশা ভরসা সম্বল করে বসে থাকত তো?

আবার এটাও মনে হয়, তাতেই বা কী ক্ষতি হত? পৃথিবীর কত লোক ওভাবেই জীবন কাটাচ্ছে তো। অবিশ্বাসের ছুরি মাখনের মত বিশ্বাসের দেওয়ালে বসে যাচ্ছে। তবু পরম নিশ্চিন্তে তারই সঙ্গে ছেলেপুলে নিয়ে সবাই সংসার করছে না? মাঝেমাঝে একথাও ভাবে শালিনী, ছোট ছোট দুটো হাতে কি বাঁধা যেত সুনীলকে? সেটাও তো ও দিতে পারেনি সুনীলকে।

এই ভাবনাটাই বড় জ্বালায় ওকে। মনে হয় ওর জাহাজে একটা বড়সড়ো ফুটো ছিল। সেটার মেরামতি করেনি ও। তাই ডুবে গেল জাহাজটা।

এখানে আসার পর বেশ কিছুদিন ঘর থেকে বার হয়নি শালিনী। শান্তদা একটা ফাঁকা ঘরে ওকে ঢুকিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "আরশিনগরের আরশিতে মুখ দেখো এবার। বিজলি বাতি, পরিশুদ্ধ পানীয় জল, ফোনের সংযোগ, কিছুই পাবেনা। কিন্তু পাবে নিজেকে খোঁজার অবসর। মোমবাতি রইল। আলো জ্বেলে নিও।"

সেই রাতটার পর অন্য রাতের শুরু। যদিও চিত্রাদি সেই রাতে ওর কাছে এসে শুয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ঝড় এসে সব ওলটপালট না করে দিলে কেউ এখানে আসেনা। এখানে মৃত্যুর শীতলতা নেই, কিন্তু সম্পর্কের বরফ সকলেই বহন করে আনে। তবে আশার কথা কী জানো, সে বরফ এখানের জলহাওয়ায় জল হয়ে নদীর সঙ্গে মেশে। এখানে থাকতে থাকতে তোমারও তাই হবে।"

প্রথমে পারেনি ও। পরে আস্তে আস্তে অনেকটা সম্ভব হয়েছে।

চিত্রাদির কথাতেই ও এখানকার মেয়েদের নাচ শেখাতে শুরু করে। এখন বেশ জমে উঠেছে সেই ক্লাস। তবে সবটাই বিনাপয়সায়। এখানকার মজাই এটা। পয়সার কোনও গল্প নেই। ঠেলাঠেলির ব্যাপার নেই। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এভাবে মাপা হয় না। শুধু চর্চা। এগিয়ে যাওয়া। আরশিনগরে না এলে এর স্বাদ কত স্বাদু, সেটা কেউ টের পাবেনা।

মাঝেমাঝে চাঁদের আলোয় ঠাকুর বাড়ির প্রাঙ্গণে একা নাচে ও। কোন দর্শক নেই, হাততালি নেই। মুক্ত হাওয়ায় দু'হাত মেলে দিয়ে নিজের অন্তরের কাছে নিজেকে নিবেদন করে ধীরে ধীরে। বড় তৃপ্ত লাগে। আরশিনগরে না এলে এসব হতনা।

একবার ও প্রস্তাব দিয়েছিল শান্তদাকে, "আমার টাকা পয়সা আমি আপনার এনজিওতে দান করতে চাই। আমার আর ওসবের প্রয়োজন নেই। নেবেন আপনি? এ্যামাউন্টটা শুনে রাখুন অন্ততঃ।"

শান্তদা বলেছিলেন "এখন না। আমার এ্যামাউন্ট শোনার দরকার নেই। আগে দশবছর যাক। তুমি চাইলে তখন দিও।" মোটে দুবছর কেটেছে। তবে সুনীলের জন্য হাহাকারটা ফিকে হয়ে এসেছে অনেকটা। অপেক্ষা চলছে। আরশিনগরের আরশিতে নিজেকে মাঝেমাঝে দেখে ও। এখনও বাকি আছে অনেকটা পথ।

শান্তদা বলেছেন, "যেদিন হবে নিজেই বুঝতে পারবে। আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবেনা।"

জানলা দিয়ে পথের দিকে চোখ রেখে চুপচাপ বসেছিল ও। হঠাৎ চোখে পড়ল নবীনা আসছে। ওর আসাটার মধ্যে কেমন যেন অস্বাভাবিকতা। মাঝেমাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। শালিনী উঠে পড়ে। তেমন কিছু হলে ওকে সাপোর্ট দিতে হবে তো।

নবীনা সোজা ঝুমুরদের বাড়ির দিকে চলে গেল। শালিনী বসেবসে ভাবছিল কী হল? নবীনা ওভাবে এল কেন ?

ও উঠে পড়ে। যাহোক দুটি ভাতে ভাত খেতেও ওকে উনুনে ভাত চাপাতে হবে। প্রতিবছর এই দিনে সবার জন্য খিচুড়ি রাঁধেন হেনাদি। এবারে সেসব হচ্ছেনা। শালিনী পা ফেলতে যেতেই পায়ের শির টেনে ধরে। ও সোজা হয়ে হাত পা গুলো ছাড়াতে ছাড়াতেই দেখে একদম অপরিচিত একটা লোক রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। শালিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় লোকটার দিকে। তেমন কিছু করলে ব্যবস্থা নিতে হবে তো। ওকে দেখেই লোকটা পিছু হটে। তারপর কিছুই যেন হয়নি এমন ভাব করে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে যায়। শালিনী ভাবে সবটাই শান্তদাকে জানাতে হবে। এ ব্যাপারটা একেবারেই স্বাভাবিক নয়। শালিনী এবার নিজের বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। শান্তদা আজ বিকেলে চলে যাবেন না যে এটা ও নিশ্চিত জানে। কেননা, লাইব্রেরিতে মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানে শান্তদা হেনাদির কিছু কথা বলার আছে বলে নোটিস পড়েছে। ও সেখানেই নাহয় এই বিষয়টা বলবে। যেতে যেতে ওর নজরে পড়ে তুলসী মীরাদির বাড়ির দিকে যাচ্ছে। গেট খুলল। ওর ভঙ্গিতে কেমন অনিচ্ছা ফুটে উঠেছে। যেন ওই বাড়িতে ও আর ঢুকতেই চায়না। শালিনী দেখে তুলসী কয়েকটা গোলাপ তুলল গাছ থেকে। মীরাদির ছবিতে দেবে হয়ত। ওর মনে হয় মীরাদি জিতে গিয়েছে। এরকম ভালবাসা কজন পায় ? বেশিরভাগ মানুষই তো ওর মত দুর্ভাগা। একজন মানুষের খাঁটি ভালবাসাও পায়না।

কদিন ধরেই দিদির বাড়িতে তুলসী একবার যাবে ভাবছে। কিছুতেই গিয়ে উঠতে পারছে না। আসলে ডাক্তারবাবুর কাছে আসার পর খানিকটা মন ঠান্ডা হলেও কষ্টটা ওর যায়নি। দিদির চলে যাওয়াটা ভারী অদ্ভুত! এতগুলো বছর ধরে ও

দিদির সঙ্গে আছে। দিদির কম খাওয়া, না খাওয়া, জ্বর জ্বালা সবকিছুতেই ও অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু দিদির এই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া, তার পরের দিনই ওকে ভাসিয়ে দিয়ে একেবারে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা ও মেনে নিতে পারছে না। ডাক্তারবাবু নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে রক্ত দেবার কথা বলেছিলেন। সেইমত ব্যবস্থাও করা হচ্ছিল তো। দিদি সময় দিল না।

ডাক্তারবাবুর কাছে আসার পর উনি রোজ ওকে উপনিষদের অনেক গল্প পড়ে শোনান। এসব ওর জানা ছিলনা। একদিন সন্ধেবেলা উনি নিজের মেয়ের কথা বললেন। তার জন্ম থেকে বড় হওয়া, পড়াশুনা, নাচের সব গল্প উনি করলেন ওকে। বলছিলেন, "আমরা খুব ভালো ছিলাম। এমনকি মেয়ে যখন একজন বিবাহিত মানুষের সঙ্গে বিয়ে না করেই থাকতে শুরু করল, মনখারাপ হলেও ভেঙে পড়িনি। শেষে ওর লিউকোমিয়া হল। আমি তো ডাক্তার। কত চেষ্টা করেছি। বাঁচাতে পারিনি। এখানে চলে এলাম। আর কী হবে ? সুখের উপচে পড়া ভাঁড়ার যখন হঠাৎ শূন্য হয়, সে শূন্যতা মানুষ নিতে পারেনা। আমারও তাই হয়েছে।"

"আপনার স্ত্রী ? তিনি এলেন না ?"

"না। ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াত। রিটায়ারমেন্টের পর বিভিন্ন আশ্রমে ঘুরে বেরিয়ে এখন এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। সেখানেই মাঝেমাঝে যায়। বাড়িতেই আছে। কাজের লোকজন আছে, তারাই দেখাশোনা করে। শান্তর হাত দিয়ে মাঝেমাঝে আমাকে চিঠি লেখে। শান্তর কাছে আমার খবর নেয়। এবার শীতে এই শালটা পাঠিয়ে দিল। তুমি নেবে ? গায়ে দেবে ?"

"না না বৌদির দেওয়া জিনিস, আপনিই গায়ে দিন। চোখে না দেখলেও মনেমনে ঠিক টের পাবেন উনি। আপনার বাড়ি যেতে, ওনাকে দেখতে ইচ্ছে করেনা ?" তুলসী জানতে চেয়েছিল।

"না বলি কীকরে ? মনের যোগ আছে তো।" ডাক্তারবাবু হাসেন। "কিন্তু আমি আর যাব না। ও আসতে চাইলে আসতে পারে। কিন্তু এখানকার এই জীবন, ও নিতে পারবে না। শুধু শুধু কষ্ট পাবে। আর আমাকেও ফিরে যাবার জন্য জোর করবে। তার থেকে ওর না আসাই ভাল।"

তুলসীর অবাক লাগে। অত বড় মাপের একজন ডাক্তার কেমন এখানে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। তুলসী আসার পর একদিন বললেন, "আমার অভ্যেস খারাপ করে দিচ্ছ। কোনও কাজ করতে দাওনা। আমাকে ছেড়ে চলে যাবেনা তো।"

তুলসী হেসেছিল, "কোথায় যাব ? ওবাড়িতে দিদিকে ছাড়া থাকব কীকরে ? আপনি আমাকে না তাড়ালে এখানেই আছি।"

আজ ও সেই দিদির বাড়িতেই এসেছে, ডাক্তারবাবুর প্রয়োজনে। উনি দিদির গানের খাতা, গানের বইগুলো দেখবার জন্য চাইছিলেন। তুলসী বলেছে, "ওগুলো আমি নিয়ে আসব। আপনি একেবারে নিয়ে নিন। ওবাড়িতে ওগুলো পড়ে থেকে থেকেই নষ্ট হয়ে যাবে। এ তবু কাজে লাগবে।"

গোলাপ গাছে ফুল ফুটেছিল। কয়েকটা তুলে নিল ও। দিদির ঠাকুরকে দেবে। বাড়িতে ঠাকুরের ছবি ছাড়া আর কোন ছবি দিদি টাঙাত না। কিন্তু ও স্মরণসভার দিন হেনাদিদের, একটা বাক্সে রাখা দিদির চমৎকার ছবি দিয়েছিল। সেটা এখন ঘরে টাঙানো আছে। ওই ছবির সামনের ফুলদানিতেও কিছু ফুল সাজিয়ে দেবে। ঘরদোর একটু ঝাড়পোঁছ করতে হবে। তুলসী দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ছিটকিনিটা বাইরে থেকে লাগানো। কিন্তু ওর কেন মনে হচ্ছে ভেতরে কেউ আছে। ও দরজা খুলে আস্তে আস্তে ঢুকল ভেতরে আর চমকে গেল। কে ওটা ? ঠাকুরের আসনের সামনে ধ্যান করছে। ও ঠিক দেখছে তো ? চোখটা একবার কচলিয়ে নেয় তুলসী। আর ঠিক তখনই শমীক চোখ খুলে চায় আর তুলসীকে বলে, বোসো। আমি পুজোটা সেরে নিয়েই তোমায় সব বলছি।

তুলসী চুপ করে বসে থাকে। ওর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ে। দিদির পুজোর আসন আর শূন্য রইল না। কে না কে এসে বসে পড়ল ঠিক। ওর বুকের ভেতরে দিদির জন্য জমে থাকা হাহাকারটা গলে জল হয়ে দুগাল বেয়ে নামছিল তখন।

# #

পুরনো একটা কাপড় আসনের মত করে পেতেছে মনুয়া। মীরাদির বাড়ি থেকে এটা নিয়ে এসেছে ও। তার সামনে জল ছিটিয়ে কলাপাতা সাজানো হয়েছে। শান্তদা, হেনাদি, চিত্রাদি আর নবীনাদি বসেছেন সার দিয়ে। অন্যদিকের আসনে বসেছে ভূষণদা, শমীক। সবাইকে দেবার পর ওরাও বসে যেতে পারবে। মনুয়ার খুব গোছ। কলাপাতার একপাশে একটুকরো লেবু একটু নুন দিয়েছে ও। গরম খিচুড়ির হাঁড়িটা কাপড়ের টুকরোয় ধরে ঠিক দুসারির মাঝে এনে বসাল মনুয়া আর ঝুমুর।

এবার খাওয়া শুরু হবে। মেনু বেশি কিছু না। খিচুড়ি, বাঁধাকপির তরকারি, বেগুনভাজা, চাটনি, আর বোঁদে। বোঁদেটা শান্তদা নিয়ে এসেছেন শহর থেকে। ভূষণদা বারবার বলেছিল, "তোমরা বোসো। আমি পরিবেশন করে দিচ্ছি।"

মনুয়া, ঝুমুর কেউ রাজি হয়নি। শান্তদা বললেন, "রান্না চমৎকার হয়েছে। খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি, সবইখুব ভাল। খিচুড়ি তো ভূষণ করেছ, তরকারি কি মনুয়া করেছে না ঝুমুর ? চাটনি কে বানাল?"

কাউকে কিছু বলতে না দিয়েই মনুয়া তড়বড় করে, "তরকারি আমি, আর চাটনি ঝুমুর।"

ঝুমুর ওর দিকে অবাক হয়ে তাকায়। ও আবার রান্নায় হাত দিল কখন ? কিন্তু প্রতিবাদ করলে মনুয়া রাগ করবে। তাই চুপচাপ থাকে।

নবীনাদি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। একটাও কথা বলছে না। হেনাদি, চিত্রাদি রান্নার প্রশংসা করলেন। কিন্তু নবীনাদি কোন কথাই বললেন না। শেষে শান্তদা বলেই ফেললেন, "নবীনা, তুমি এরকম অফ্‌ মুড হয়ে আছ কেন ? কথা বলো। এত ভয় পাওয়ার কিছু হয়নি।"

নবীনাদি ম্লান হাসেন। "ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ওরা আমাকে ফলো করার লোক রেখেছে। যদি আমার পেছন পেছন এসে এই জায়গাটা দেখে যায়, তাহলেই সব শেষ। আমারই ভুল। শান্তদার সঙ্গে যখন আসতে পারলাম না তখন না এলেই হত। মিছিমিছি ওদের সুযোগ করে দিলাম। এবার কী যে হবে?"

"সে যখন হবে তখন দেখা যাবে। এখন তো ভয় না পেয়ে একটু আনন্দ করে নাও।" শান্তদার কথা শুনে

নবীনাদি কষ্ট করে হাসে। শমীকের দিকে তাকিয়ে বলে, "তোমার এখানকার ঘটনা শুনেছি। রাতে দরজা ভেতর থেকে দিয়ে দাও তো ?"

শমীক একটু চুপ করে বলে, "দরজা দিই। তবে ওরা এলে দরজা ভেঙেই ঢুকবে। দেওয়া আর না দেওয়া একই ব্যাপার। আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। ওদের আমি চিনি। কোনও কিছু নিয়েই ওদের কিছু এসে যায়না। ওরা এলে সব চুরমার করে যা করার তাই করে দিতে পারে।"

ওর কথা শুনে ঝুমুর শিঁটিয়ে যায়।

নবীনা বলে "শান্তদা কিছু বলুন। আমার সত্যি ভয় করছে ! ঝুমুর বেশ ছিল এখানে, আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম। এখন যদি লোকরঞ্জন গুন্ডার দল পাঠায় কী হবে ভাবতে পারছি না।"

শান্তদা স্পষ্টতঃই বিরক্ত হন। "বারবার এককথা বলোনা তো। আমি দেখছি কী করা যায়। এখন যা করছ কর। খিচুড়ি ভালো করে খাও। মনুয়া আর একটা বেগুনভাজা হবে?"

শালিনী এল ওদের খাওয়া শেষ হবার পরে। ও আসাতে শমীককে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ওর কথা শুনে ঘাবড়ে গেল নবীনা। লোকটা এই অবধি এসেছিল। ব্যাপারটা ছেড়ে দিলে চলবে না। শালিনী চলে যেতে, সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য সবাই মিলে গোল হয়ে বসা হল। অনেকদিন এভাবে বসা হয়নি। মীরা মারা যাবার পর থেকেই কী যে হয়েছে আরশিনগরের, কোন না কোন অঘটন লেগেই আছে।

হেনাদি বলেন, "সমস্যা যা কিছু এই অবস্থাতেই মেটাতে হবে। শমীক আর ঝুমুর দুজনকে নিয়েই সমস্যা, তোমরাই বল কাকে কোথায় নিয়ে যাব? একেবারেই ঝামেলা মেটাতে চাইছি। বেশি মাল সঙ্গে নেওয়া যাবেনা। শুধু কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সে কাছে রাখতে পারবে। ঝুমুর কে একা কোথাও পাঠালে ও মনকষ্টে থাকবে। যদিও কারো পক্ষে ওকে নিজের কোন লোকের কাছে বা অন্য কোথাও রেখে দেওয়া সম্ভব হয়, সে প্রস্তাব দিতে পারো। নাহলে মনুয়া তো আছেই। ওদের দুজনকেই ব্যবস্থা করে একসঙ্গে রাখতে হবে। মোটমাট এখান থেকে দূরে ওদের নিয়ে যেতে হবে।"

মনুয়া বলল "তার থেকে আমাদের দূরের কোনও হোমে পাঠিয়ে দাও দিদি। তোমরাও নিশ্চিন্ত হবে। আর আমাদের পক্ষে যদি সম্ভব হয় হাতেরকাজ বা পড়াশুনা শিখতে পারব।"

"ঠিকই। তবে সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করার একটা ব্যাপার আছে। তাতে সময় লাগবে। ততদিন তোমরা কোথায় থাকবে?" চিত্রাদি জানতে চান।

নবীনা দেখল, শান্তদা একপাশে চুপ করে বসে আছেন। হেনাদি শান্তদাকে বললেন, "কী হল শান্ত, তুমি কিছু বলছ না যে?"

"আমাকে একটু ভাবতে দাও। তারপর তো বলব।" শান্তদা কথা শুরু করলে সবাই চুপ করে যায়।

"ভেবে দেখো, লোকটা আপাততঃ ফিরে গিয়েছে যখন, এখুনি ও ঝুমুরের ঠিকানা বার করতে পারবে না। ততক্ষণ সময় আছে। আর শমীক এবার আমার সঙ্গে যাবে। ওকে এনজিওর কাজে এমন কোথাও পাঠিয়ে দেব, যে ওরা ওকে খুঁজে পাবেনা। সেকদিন, ভূষণ তোমার বিদ্যা প্রয়োগ করে এদের অন্যমানুষ করে দাও। আমি চাই যেন আমিও এই দুজনকে চিনতে না পারি।"

"মানে? নবীনা অবাক হয়।"

হেনাদি হাসেন, "ও তোমরা জানো না বুঝি, ভূষণ একজন খুব বড় মেকাপ আর্টিস্ট। ও বেশ বড় দলেই ছিল। তবে সেসব ছেড়েছুড়ে চলে এসেছে। আর সে কথা কাউকে বলা বারণ।"

শমীক বলে ওঠে, "আমার একটা কথা বলার ছিল। আজ একটা ঘটনা ঘটেছে। মীরাদির বাড়িতে তুলসী হঠাৎ চলে এসে আমাকে দেখে খুব অবাক হয়। ওকে আমি সবকথা বলতে পারিনি। শুধু জানিয়েছি, ভূষণদা আমাকে ওখানে থাকতে দিয়েছেন। কিন্তু মুস্কিল হল যদি ও সবাইকে আমার কথা বলে দেয়, তখন কী হবে? বিপদ বাড়বে বই কমবে না।"

শান্তদা বলেন, "তুলসীকে যা বলার আমি বলে দেব। ডাক্তারবাবু ছাড়া ও কাউকে কিছুই জানাবে না যে সেব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আর ডাক্তারবাবু তো তোমাকে বাঁচিয়েছেন। ওনাকে বাকিটা জানাতে হবে। এবার ওঠা যাক। আজ রাতের মধ্যে আশাকরি তোমাদের কোনও বিপদ হবেনা।"

সবাই চলে যাবার পর ঝুমুর আর মনুয়া বিছানায় একসঙ্গে শুয়েছিল। নবীনাদি চিত্রাদির সঙ্গে গিয়েছেন। যোগব্যায়ামের নতুন কী আসন শিখবেন। ঝুমুর চুপচাপ চোখের ওপর হাত রেখে শুয়ে আছে। মনুয়া ওর হাতটা চোখ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলে, "তাকা আমার দিকে। যতক্ষণ আমি আছি তোর কিছছু হবেনা। আমি বলছি তো।"

ঝুমুর তবু চুপ করে পড়ে থাকে। মনুয়া ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, "জামাইবাবুরও কিছু হবেনা। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

এবার ঝুমুর ফিক্ করে হেসে ওর চুলের মুঠি ধরে নেড়ে দেয়। মুখটা আবার বিষণ্ন হয়ে যায় ওর। বলে, "তোর যত ফাজলামি। এতবড় বিপদ সামনে, তবু নির্বিকার। এত সাহস কোথা থেকে পাস বলতো ? আমি ভাবছিলাম আমার মার কথা। অনেকদূরের হোমে চলে গেলে আর দেখা হবেনা তো।"

মনুয়া একথাটার উত্তর খুঁজে না পেয়ে ওর মুখের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। বিড়বিড় করে বলে,"ঝুমুর, তোর তো তবু মা আছে রে, আমার মা সেই কবে ... ।" কথাটা আর শেষ করেনা ও। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুক ঠেলে ওঠে। ঝুমুর সে আওয়াজ শুনতে পায়না।

সন্ধে সবে নেমেছে, তুলসী ডাক্তারবাবুর ঘরে বাতির আলো জ্বালিয়ে বাইরের উঠোনে এসে বসল। এই সময়টা প্রতিদিন ওর বড় খারাপ কাটে। দিদির বাড়িতে কাটানো দিনগুলো মনে পড়ে। সন্ধেবেলা ও সব ঘরে কাঁচ দিয়ে ঘেরা আলো জ্বেলে দিত। দিদি তুলসীতলায় মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে বসত নিজের ঘরে, ঠাকুরের বেদির সামনে। তারপর একটার পর একটা ভজন গেয়ে যেত নিজের মনে। কতদিন তুলসী দেখেছে পথে যেতে যেতে লোকে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিদির ভজন শুনছে। আর এখন কোথাও কোনও সুর নেই। চারপাশের নিস্তব্দ পরিবেশ ওকে গিলতে আসছে। বসে থাকতে থাকতে ওর খেয়াল হল খুব দ্রুত এসে কে ওদের বাড়ির গেট খুলছে। বলাকা না ? ওই মেয়েটাই তো শালুর সঙ্গে থাকে। ও হঠাৎ এখানে কেন ?

বলাকা ডাকতে ডাকতে ঢোকে। "ডাক্তারবাবু ,ডাক্তারবাবু, কোথায় আপনি ?"

"এই তো, কী হয়েছে ?" বলতে বলতে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে আসেন।

"আবার সেরকম। আপনি তাড়াতাড়ি চলুন।" বলতে বলতে বলাকা এগিয়ে আসে।ওকে দেখে থমকায় একবার। তারপর ডাক্তারবাবুর ব্যাগ হাতে করে এগিয়ে যায়।

ডাক্তারবাবু ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমিও চল আমার সঙ্গে, দরকার পড়লে কাজে লাগবে।"

পেছন পেছন গেলেও বলাকা চাইছিল না ও ওদের ঘরে ঢোকে। কিন্তু ডাক্তারবাবুর কথায় ও ঢুকতে বাধ্য হয় ! ঘরে জল থই থই করছে। বোঝাই যাচ্ছে ইচ্ছে করে কেউ জল ছড়িয়েছে। এসব কিছুর মাঝে হাত পা এলিয়ে পড়ে আছে শালু। ওদের দেখেও চোখ খোলেনা।

"এতো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। কী হয়েছিল কী ?" ডাক্তারবাবুর কথা শুনে বলাকা লজ্জাশরমের বালাই না রেখেই সব কিছু খুলে বলে।

"কিছুদিন ধরে বায়না ধরেছিল বাড়ি যাবে। আমি যেতে দিইনি। সেই রাগে চন্ডালের মত মুখ করে আমাকে তেড়ে এসেছিল। ওই দেখুন না জল ছড়িয়েছে কেমন !"

ডাক্তারবাবু শালুর মুখে চোখে বলাকাকে জলের ছিটে দিতে বলেন। একটু পরেই চোখ খোলে ও। বলাকার দিকে তাকায় না। ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে কাকে যেন খোঁজে । ডাক্তারবাবু হাঁ করিয়ে ওর মুখে ওষুধ ঢেলে দেন। ব্যাগ খুলে ওষুধ বার

করে বলাকার হাতে তুলে দেন। নিচু স্বরে বলেন," এই ওষুধ খাওয়াতে গেলে ও খাবেনা। তুমি গুঁড়ো করে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিও।"

ফেরার পথে যেতে যেতে শালুর গল্প করেন ডাক্তারবাবু। শালুর বাড়ি ছিল মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রামের কাছের একটা গ্রামে। ওর বাবার কাঠমিস্ত্রি হিসেবে বেশ নাম ছিল। তাই বাড়িতে সবাই অর্ডার দিয়ে গেলে শালু বাবার সঙ্গে টুকটাক কাজে হাত লাগাত। ওর হাতের অপূর্ব নকশা দেখে সবাই বলত ওকে ভালো করে কোথাও কাঠের কাজ নিয়ে পড়ালে ও নামকরা মিস্ত্রি হতে পারবে।

সেইসময় হুগলীর পলিটেকনিক কলেজের মাষ্টারমশাই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ঝাড়গ্রামে আসেন শিক্ষামূলক ভ্রমণে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামে গঞ্জে বংশ পরম্পরায় কিভাবে কারিগররা হাতের কাজ শিখছে করছে সেসবের খোঁজখবর করা, সেসব স্বাভাবিক শিল্পীদের কাছে পৌঁছে যাওয়া। তারা শালুর বাবার কাজের সুনাম শুনে সেখানে দেখা করতে গিয়ে শালুর কাঠের কাজের অশিক্ষিত নৈপুণ্য দেখে অবাক হন। মাষ্টারমশাই ক্লাস টেন পাস শালুকে তাদের কলেজে ভর্তি করার জন্য তার বাবাকে পরামর্শ দেন। সেইমত শালু পলিটেকনিক কলেজে কাঠের কাজের বিভাগে ভর্তি হয়।

এরপরে শালুর শহুরে জীবন শুরু হয়, আর তার জীবনে আসে বলাকা। বলাকা ইলেকট্রিকাল বিভাগের ছাত্রী ছিল। শালুর সঙ্গে বলাকার সম্পর্ক ঘন হলে শালু বাড়িতে বলাকাকে বিয়ে করার কথা জানায়। ততদিনে তারা দুজনেই পাস করেছে, চাকরি পেয়েছে। শালুর বাবা বলেন, বলাকাকে বিয়ে করলে তিনি শালুকে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না।

পরে সব ঠিক হয়ে যাবে ভেবে ওরা দুজনে বিয়ে করে সংসার পাতে। কিন্তু শালুর বাবা শালুদের বিয়ে মানেন না। শালু নিজের মাকে ভীষণ ভালবাসত। কলেজ থেকে প্রতি সপ্তাহে মাকে দেখতে বাড়ি যেত। নিজের মনের কষ্ট চাপতে না পেরে ও একবার বলাকাকে না জানিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে যায়। ওর বাবা ওকে দেখা করতে দেন না। তার কিছুদিন পর থেকেই শালুর এই রোগের উদ্ভব। ক্রমশঃ ও বাড়াবাড়ি রকমের ঝামেলা শুরু করে। তখন বলাকার সঙ্গেও খুব খারাপ ব্যবহার করত। বলাকাকে না বলেই এদিক ওদিক চলে যেত। অফিস কামাই করতে করতে চাকরি চলে যায়। সেটাও বলাকা জানতে পারে অনেক পরে।

মেয়েটা সত্যিই শালুকে ভালোবাসে, ওর জন্য ভাবে। শালুর সঙ্গে থাকার জন্য নিজের চাকরিতে আবেদন করে টানা ছুটির ব্যবস্থা করেছে ও। এখনও জানেনা ওর চাকরি থাকবে কিনা।

ডাক্তারবাবুকে বলেছিল ও, "ডাক্তারবাবু, আমাকে মনের ডাক্তার বললেন, ওকে নিয়ে এমন কোথাও চলে যান যেখানে কোন টেনশান নেই, ও মনের আনন্দে থাকতে পারে। সেখানে গিয়ে যদি ও ওর বাড়িতে না যাওয়ার দুঃখ ভুলতে পারে ও বেঁচে গেল। নাহলে ওর মাথাও একেবারে খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্স আছে। আমি শুধু ভেবেছি কোথায় যাব ? শান্তদা আমার দাদার বন্ধু। উনি এখানে আসার ব্যবস্থা করে দেন। এখানে ও ভালোই আছে, মাঝেমাঝে খ্যেপে ওঠে। আজ যেমন হল।"

ডাক্তারবাবু জানতে চান, "হঠাৎ এমন হলই বা কেন?"

"আজ সরস্বতী পুজোর পরে দুপুরে বাড়ি ফিরে এসে ও আমায় একদম স্বাভাবিক গলায় নিজের বাড়ির পুজোর গল্প করেছে। ও আমায় বলছিল সরস্বতী পুজোর দিনে ওদের বাড়িতে পুজো হত। সেদিন ওর মা খুব ভালো খিচুড়িভোগ বানাতেন। পাড়াঘরের কেউ কেউ ওদের বাড়ি থেকে ভোগের খিচুড়ি চেয়ে নিয়ে যেত। দুপুরে এসব গল্প হয়েছে। তারপর ও ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠল তখন প্রায় সন্ধে। তারপর গুম হয়ে বসেছিল। আমি চা দিতেই সবটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করল। তখনই দেরি না করে আমি আপনাকে ডেকে নিয়ে আসি। আমার আর ধৈর্য থাকছে না। এবার ভাবছি ওকে ওর বাড়িতে দিয়ে আসব। আর আমি ডিভোর্স নিয়ে নেব।"

"এ আবার কী কথা? তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে একথা বলবে কেন ?" ডাক্তারবাবু বকেন ওকে।

"মনে হচ্ছে আমি হেরে গেলাম। ও ওর বাবা মার কাছেই চলে যাক। আমি সরে যাব। আর বেশি দেরি করলে ওরও মাথাখারাপ হবে, আমার চাকরিটাও থাকবে না। তখন আমি কী নিয়ে থাকব ?"

ডাক্তারবাবু নিজের মনেই মাথা নাড়েন। ধীরে ধীরে বলেন, "এইসব বাবা মাদের নিয়ে আর পারা গেলনা। এরা কী চায় বল তো ? নিজের জেদের জন্য ছেলের বাঁচা মরার ধার ধারেনা ! ভাবছি, শান্তকে নিয়ে একবার শালুর বাবার কাছে যাব।"

"আপনি আরশিনগর থেকে বেরোবেন ?" তুলসী অবাক হয়ে জানতে চায়।

"অবাক হচ্ছ ? আমার একমাত্র মেয়েকে হারিয়েছি। সন্তানহারা বাবা মার দুঃখ আমার থেকে বেশি কে বুঝবে বল ? না না আমাকে যেতেই হবে। ওদের বোঝানো দরকার। যা করছে, ঠিক করছে না।"

# #

হেনা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তরকারি কুটছিলেন। আজ বেশি কিছু না, একটু আলুচচ্চরি আর ময়দা করবেন। গাছের কটা বেগুন ছিল। লম্বা লম্বা করে কেটেছেন। ওগুলো ভাজা হবে। শেষপাতে সুজির পায়েস থাকবে একটু। নিজের জন্য এত গোছ করে রান্নাবান্না করেন না। শান্ত, নবীনা আর চিত্রাকে খেতে বলেছেন।

তার রান্নাঘরটা একটু ভাঙাচোরা হলেও কেতার। একদম প্রথম দিকে আসায় সম্ভবতঃ আগের কারখানার ম্যানেজারের বাংলোটা তিনি পেয়েছেন। বাড়ির মধ্যেই একটা বড় হল আছে। ছোটখাটো অনুষ্ঠান ইচ্ছে করলেই করা যায়। চিত্রা আরশিনগরে এসেছিল ঠিক তার পরে। ও একটা বাংলো পেয়েছিল । তবে তার মত আয়তনের নয়। তাদের বাড়িগুলো সারাই করলে একেবারে হেসে উঠবে। কিন্তু অনেকটা টাকাপয়সা লাগবে, দেখাশুনা করতে হবে, ভেবেই পিছিয়ে গিয়েছেন তারা। তাছাড়া এখানে তো তাদের জীবনযাপনের উদ্দেশ্য আলাদা। তাই আর গা করেননি।

হেনাদি পরোটা ভাজতে ভাজতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। আজ তার স্বামী শরৎশশীর জন্মদিন। আর এইদিনেই তাদের বিচ্ছেদ হয়। কুড়িবছরের ছোট ছাত্রীর জন্যে পঞ্চাশ বছরের মাষ্টারমশাই তাকে ছেড়ে চলে যান। মাঝেমাঝে মনে হয় অতদিনের সম্পর্কে এটাই কী তার পাওনা ছিল ?

কলেজ থেকেই হেনাদের বন্ধুত্বের শুরু। একটু দেরিতেই বিয়ে। তারপর দেশে বিদেশে কর্মজীবনের বেশিটাই একসঙ্গে কাটিয়েছেন তারা। শরৎশশী যাবার সময় তার মুখোমুখি হননি। চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন তার সঙ্গে সম্পর্ক আর রাখতে পারছেন না। তিনি যেন বোঝেন, তাকে মাপ করে দেন।

ছেলেমেয়ে হয়নি। স্বামী ঘিরেই কর্মব্যস্ত জীবন কাটিয়েছিলেন। চলে যাবার আগের মুহূর্ত অবধি বোঝেননি এতবড় একটা বিশ্বাসঘাতকতার তুফান তার জন্য অপেক্ষা করছে। তারপর বেশ কিছুদিন নড়বড়ে জীবন কাটান। একবার আত্মহত্যা করতেও গিয়েছিলেন। তাকে বাঁচায় দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী ভোলা।

তিনি বলেছিলেন ভোলাকে, "আমাকে এমন একটা কোথাও নিয়ে চল, যেখানে কোনও মানুষ বাস করেনা। কোন মানুষের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হবেনা। কেউ আমার কাছে ওনার কথা জানতে চাইবে না। সেখানে যত কষ্টই থাক আমি বাঁচতে পারব। এখানে থাকলে আমি মরে যাব।"

ভোলা কথা রেখেছিল। ভোলাদের বাড়ি পাশের গ্রামে। ও এই কারখানা পরিত্যক্ত জায়গার সন্ধান রাখত। এখানে তখন শেয়াল কুকুর ছাড়া কেউ থাকেনা। ভোলা আর তিনি একসঙ্গে বাড়ি পরিষ্কার করে বাসযোগ্য করেছেন। বাগান করেছেন। পুরনো পথ, পুরনো ইঁদারাকে ব্যবহার যোগ্য করেছেন।

তাঁরা থাকতে থাকতেই এল চিত্রা, এল বাসন্তী পাইন। শান্ত এনজিওর কাজে ঢুঁ দিল আরশিনগরে। তারপর কত মানুষ এসেছে। আস্তে আস্তে তিনি গড়ে তুলেছেন লাইব্রেরি। চিত্রার বাড়িতে হয়েছে যোগ ব্যায়ামের কেন্দ্র। শরৎশশীর স্মৃতি তাঁকে আর তেমন তীব্র কষ্ট দেয়না। ভোলা এখনও তার কাছেই থাকে। রবিবার বা ছুটির দিনে তাকে ঠেলে বাড়ি পাঠান তিনি।

ভাবতেও অবাক লাগে আজ কত বিখ্যাত মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন ! কোন কষ্টই তাদের ঘায়েল করতে পারেনি। কোন আরাম নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, শুধুমাত্র স্বইচ্ছায় এখানেই বাস করছেন তারা। তাহলে কি মানুষের ওই বিলাসিতার সংসার তাদের কিছুই দেয়নি ? নাকি তার মতই অঢেল দিয়ে কেড়ে নিয়েছে হঠাৎ করে?

পরোটা ভাজতে ভাজতে উত্তর খুঁজছিলেন তিনি। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। পুরনো সেইসব দিনের কথা মনে পড়ছিল তার। এখনও মনে পড়লে বুকের ভেতরে যেন কীট দংশন হয়। চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ে। শরৎশশীকে এ জীবনে তিনি একেবারে ভুলে যেতে পারলেন না।

শালিনীর জীবনেও নাকি তারই মত কষ্ট জমে আছে। একদিন ঠাকুর বাড়ির প্রাঙ্গণে তাকে সেই কথাই বলছিল ও। তিনি কোন সান্ত্বনা দিতে পারেননি। ও তো জানেনা তিনিও ভুক্তভোগী। ঘটনা এক, খালি রঙ আলাদা। একথাও মনে হয়, এরা তাদের বিশ্বাস নষ্ট করেছে ঠিকই, কিন্তু ভন্ডামী করেনি। সংসার ছেড়ে চলে গিয়ে মুক্তি দিয়েছে সহবাসের থেকে। দুনৌকায় পা রেখে তাদের ঠকাত যদি, সেকি আরো খারাপ হতনা? তেমনও কেউ কেউ করে তো।

হাত চলছে, কিন্তু মন অন্যদিকে, তখনই শুনলেন কেউ ডাকছে তাকে, "হেনাদি, দরজা খোল, আমরা এসে গেছি।"

প্রথমেই ঢুকল শান্ত, ওর হাতে কফি আর দুধের প্যাকেট। শীতকালে দুধ চিনি বেশি করে দিয়ে কফি খেতে ভালবাসেন তিনি। ঠিক মনে রেখে শহর থেকে শান্ত নিয়ে এসেছে তার জন্য। নবীনার হাতে মুরগীর ডিমের ঠোঙা। মনুয়া, ঝুমুররা পাঠিয়েছে বোধহয়। চিত্রা এনেছে ওর বাগানের বেগুন, ফুলকপি আর গোলাপ ফুল। বড় হল ঘরটায় টেবিলের ওপর সবকিছু সাজিয়ে রাখল ওরা। হেনার মনে হচ্ছিল, সম্পর্ক ভাঙে যেমন, গড়েও তো। এই যে মানুষগুলো শুধু তারই জন্য এসেছে, এদের ভালোবাসাই বা কম কী ? কেন যে শুধুশুধু মন খারাপ করেন তিনি। এগিয়ে এসে একটা গোলাপ নবীনার খোঁপায় গুঁজে দেন। ভালো করে তাকিয়ে দেখেন ওকে, ঠোঁট শুকনো। সুন্দরী নবীনাকে কেমন যেন ম্লান দেখাচ্ছে না ? কী হয়েছে ওর?

# #

ভোর ভোর উঠে ফিরে চলেছে নবীনা। গতকাল রাতে ও ঝুমুরদের সঙ্গে ছিল। ওরা অনেক করে বলছিল আজকের দিনটা থেকে যেতে। ওরা বোঝেনা, ওকে কতগুলো দায়িত্ব একই সঙ্গে মেটাতে হয়।

স্কুলে আজ আনন্দভোজ। সরস্বতী পুজোর পরে হওয়া এই ভোজে ওর উপস্থিতি খুব জরুরি। নাহলে বড়দি খুব রাগ করবেন। উনি ওকে বলেছেন, "তোমাকে বিশেষ করেই আসতে বলছি। পুরনো নতুন সব মেয়েরাই আসবে। আমি লক্ষ্য করেছি, ওরা তোমাকে ঘিরে থাকে, ভালবাসে তোমায়। সেই দৃশ্যটা আমি স্টাফ, টিচার, সেক্রেটারি সবাইকেই দেখাতে চাই।"

"কেন দিদি? ওই দৃশ্য দেখিয়ে কী লাভ হবে ?"

"কমিটির মিটিং হলে আমি বলতে পারব যে মেয়েরা তোমাকে চায়, আর তোমার উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে। কাজেই তোমাকে বারবার ভেকেন্সিগুলোতে ডেকে আমি কিছু ভুল করিনি।" বড়দির কথাটা ও মানার চেষ্টা করছে। একা একা ভোরে জঙ্গলের পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ায় একটু রিস্ক নেওয়া হয়ে যায়। তাই ভূষণদাকে ও সঙ্গে নিয়েছে। নদী পেরিয়ে ও একাই যেতে পারবে, তার আগের পথটা একটু চিন্তার।

ওর বাড়ি ফেরার আর একটা বড় কারণ আছে। গতকাল শান্তদা রাতে ওকে ঝুমুরদের বাড়ি পৌঁছতে যান। পথে ওর কাছে জানতে চান, "তুমি কী এরমধ্যে নার্সিংহোমে গিয়েছিলে ?"

ও বলেছিল "না। কেন ? আমি তো বিদেশের খোঁজ ফোনে নিয়েছিলাম। ও তো ভালই আছে।"

শান্তদা তখন বললেন, "একবার গেলে পারতে। ও আমার কাছে তোমার খোঁজ করেছে। নার্সিং হোমে রুগীদের ফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়না। তাই তোমার সঙ্গে কথা বলাতে পারিনি। শুনলাম ও কারো সঙ্গে কথা বলছে না, গুম হয়ে আছে। দেব বলছিল, এমনিতে ওর শরীর ঠিকই আছে। শুধু মানসিক সমস্যা যাচ্ছে না। ওটা কাটাতে না পারলে ওকে মেন্টাল হসপিটালে পাঠাতে হবে। আমার ইচ্ছে ওকে কিছুটা সুস্থ করে ওখান থেকেই আরশিনগরে ফেরৎ আনি। ওর নেগেটিভিটিটাই সমস্যার। ওকে পজিটিভ করতে গেলে তোমার হেল্প অবশ্যই লাগবে নবীনা।"

ও বলতে চেয়েছিল, "কিন্তু আমি যে জড়াতে চাইনা। ওর আমার ওপর এই নির্ভরতা আমার ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

কিন্তু শান্তদাকে ও সেকথা বলেনি। বলেছিল, "না। যাওয়া হয়নি। নানারকম কাজে ফেঁসে গিয়েছিলাম।"

শান্তদা বোধহয় ওর কথাটা বিশ্বাস করেননি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, "যা ভালো বোঝো কোরো। তোমাকে তো আমি জোর করতে পারিনা। তবে ছেলেটা একেবারে একা। তোমার বাড়িতে গিয়ে, তোমার সঙ্গ পেয়ে একটু চাঙ্গা হয়েছিল। ওকে ভারসাম্যে ফেরানোর জন্য নাহয় একটু সময় দিলে। তাতে যদি ও বোধে ফেরৎ আসে। বাকিটা তোমার ইচ্ছে।"

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিদেশের কথাই ভেবেছে ও। নবীনা জানে, বিদেশ ওর সঙ্গ পেলে হয়ত একেবারে সুস্থ হয়ে যাবে। আর এর জন্য ও নিজের দায় অস্বীকার করতে পারেনা। এমনিতে ছেলেটাকে ওর ভাল লাগত। তাই আরশিনগরে গেলে ওর সঙ্গে দেখা করত। তবে তার বেশি না। সহানুভূতি কী ভালোবাসা হতে পারে ? ও হয়ত কাউকেই আর ভালবাসতে পারবে না।

পথে যেতে যেতেই এসব ভাবছিল ও। ভূষণদা দাঁড়িয়েছিল নদীর ওপারে। নদী পেরিয়ে এবার একদম একা এগিয়ে চলেছে ও। বাসে ওঠার পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমোতে ঘুমোতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল নবীনা। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে শৈবাল। ওর হাত ধরে টানছে, বলছে, "তুমি যাবে কোথায় ? আমার কাছেই থাকতে হবে। আমি তোমার স্বামী না ?"

অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। সেই শৈবাল। ওর জীবনের শনি। ডিভোর্সের পরও কলকাতায় এলে, ভয় দেখিয়ে ওর নামে চিঠি পোস্ট করতে ছাড়েনা।

বাসের জানলা দিয়ে হু হু হাওয়া আসছে। চারপাশের মানুষেরা কেমন চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে আছে। শুধু ওর মনেই যত অশান্তির নাচন। সিটের ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা বউ তার বাচ্চাকে নিয়ে টলে যাচ্ছে। নবীনা হাত বাড়িয়ে নিল বাচ্চাটাকে। সে হাঁ করে ওকে দেখতে দেখতেই ওড়নাটা ধরে নিয়ে মুখে পুরল। ওড়নাটা টেনে নিতে নিতে নবীনা ভালো করে দেখল বাচ্চাটাকে। কপালের বাঁদিকে একটা কালো বড় টিপ পরেছে। পাউডার বুলিয়ে সেটাকে আবছা করা হয়েছে। টানা বড় বড় চোখে, ধ্যাবড়া করে কাজল পরানো। বাচ্চাটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। ও বুঝেছে হয়ত, এটা ওর মা নয়। নবীনা পেটে টিপুনি দিয়ে হাসায় বাচ্চাটাকে। আর নিজেও হাসে। তাকিয়ে দেখে বাচ্চার মা হাসছে।

উনিশ কুড়ি বছরের একটা মেয়ে। সাধারণ লাল রঙের শাড়ি পরা। কপালে সিঁথিতে সিঁদূর চিহ্ন। কিন্তু মেয়েটার হাসির জেল্লা দেখে ওর নিজের জন্য কষ্ট হয়। ওরকম একটা হাসি ও নিজে কখনই হাসতে পারেনি এ জীবনে। সরল, নির্ভেজাল একটি হাসি!

বাচ্চাটা জামা খামচায়, কামিজে নাল ফেলে। নবীনা নির্বিকার বাচ্চা কোলে বসে থাকে।

শৈবালের সঙ্গে প্রথম গোলমালের সূত্রপাত এই বাচ্চা নিয়ে। শৈবাল ওকে আদর করতে করতে চূড়ান্ত মুহূর্তে বলেছিল, "আমি বাচ্চা চাইনা। কথাটা খেয়াল রেখো।"

ও সরে যেতে চেয়েছিল তখুনি। "বাচ্চা চাওনা মানে? আমি চাই বাচ্চা। বিয়ে করেছ, বাচ্চা চাওনা কেন?"

"আমি ওসব ঝামেলায় যেতে চাই না বুঝলে। হাঁ করে কী দেখছ? কাছে এসো।" নবীনাকে নিজের কাছে আনার জন্য টানছিল ও।"

নবীনা বলেছিল, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। একথা তুমি বিয়ের আগে আমায় বলোনি কেন?"

"বেশ করেছি। আমার যা ইচ্ছে তাই করব। কৈফিয়ত চাওয়ার তুই কে?" বলে জোর করে অধিকার করেছিল ওকে। নবীনা ছাড়াবার চেষ্টা করতে ঠাস করে একটা চড় মেরেছিল গালে।

সেই সূত্রপাত। বিদেশ বিভুঁই-এ সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ। মনের কথা বলার লোক নেই কোনও। আর রাত হলেই ভয়ে শিঁটিয়ে থাকা। সেই সময়ে ওর মনে হত দিনের পর দিন এই ধর্ষণ চলতে পারেনা। শুধু রাতে নয়, দিনেও এতটুকু বিচ্যুতি হলে গায়ে হাত তুলত শৈবাল। ছুটির দিনে ওকে রেখে একা বেরিয়ে যেত ফূর্তি করতে। বড় আশা করে বিদেশে কর্মরত বড় ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। বাবার মন ভেঙে যাবে ভেবে বেশ কিছুদিন চুপ করে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল নবীনা। কিন্তু ওর বিদ্বান বুদ্ধিমান স্বামী যেদিন বাড়িতে মহিলা ঢোকাল, ওর বেড রুমের দরজা ওর সামনেই বন্ধ করল, সেদিন ওর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। ও বাধা দিলে সেই মহিলার সামনে, "আঃ তু তু" করে শৈবাল ডেকেছিল ওকে।

সেই অপমানের পর বাবাকে ফোন করায় বিয়ের ছমাসের মাথায় বাবাই ব্যবস্থা করেন। দেশে ফেরৎ আসে ও। আরও ছমাস লাগে সব সামলাতে। পুরো একটা বছর নবীনার মিছিমিছি নষ্ট হয়ে যায়। কী ভয়ানক দুঃস্বপ্নের দিন সেসব! সেইসব দিনের কথা ও আর ভাবেনা। স্বপ্ন ভাঙলে তা জোড়া লাগে। কিন্তু নিজের জীবনে আবার সবকিছু শুরু করার কথা ও ভাবেনা। ভাবেনা আর কোনও পুরুষমানুষের কথা। গতকাল রাতে বাড়ি ফেরার পর পিসিমনি ওকে বলেছিল, "নার্সিংহোম থেকে ফোন এসেছিল। তোকে ফোন করতে বলেছে।" ও জবাব দেয়নি। মনেমনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিদেশকে ছেড়ে দিলে হয় আরশিনগরে, নয় মেন্টাল হস্পিটালে দিয়ে আসবে। বাড়িতে আনবে না।

ওদের বাগানে একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ আছে। প্রায় সারাবছর ফুল দেয় গাছটা। সেই গাছটার মাথায় কিছুদিন আগে হঠাৎ বাজ পড়েছে। শুকিয়ে গেছে সেই গাছটার বেশিরভাগ ডাল। ও ভাবছিল এই হঠাৎ বাজের ধাক্কা ওকেও ভোগ করতে হয়েছে তো। বেশ হয়েছে। গাছটাও বুঝুক। মাথায় আচমকা বাজ পড়লে কেমন লাগে। আর পাখি বসবে না। বোলতা বাসা বাঁধবে না। ফুল ফুটবে না। তিলতিল করে মরে যাবে গাছটা।

কিন্তু আজ সকালে ও বাগানে জল দিতে গিয়ে দেখেছে, ওই গন্ধরাজ গাছটার একেবারে নীচের দিকে একটা ডাল গজিয়েছে। তাতে আবার একটা ছোট কুঁড়ি এসেছে। না গাছটা মরেনি। ওটা আবার ফুল দেবে। গতকালের খাওয়াদাওয়ার জন্য স্কুলের আজ ছুটি। ও বেলা অবধি বসেছিল বাগানে। গাছের কুঁড়িটা ফুটিফুটি হয়ে আছে। ফোটেনি এখনও। ও ভাবছিল গাছটার কথা। ভাবছিল নিজের কথা।

# #

"দুপুরে আমি একটু বিশ্রাম করি। এখন বিকেল। সাড়ে চারটে বাজে। বিকেলের চা বিস্কুট খেয়ে আমি বারান্দায় আমার লেখার টেবিলে এসে বসেছি। বেশ কয়েকবছর হয়ে গেল আমি আরশিনগরে আছি। এ এক অদ্ভুত পৃথিবী। এখানে আসা যায়। যাওয়া যায় না। এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিল মীরা। নিঃশব্দে প্রায় চলে গেল অন্য পৃথিবীতে। ওর শূন্যস্থানে আবার কেউ আসবে। কিংবা এসে গিয়েছে। আমার জানা নেই। আমি নির্জনে আছি। কারোর কোনও খবর, খুব একটা রাখিনা।"

ডায়েরি লিখছিলেন তপনতনু। উনি একজন সাহিত্যিক। একসময় বেশ নাম করেছিলেন। অনেকদিন তিনি নিরুদ্দেশ। তবে লেখা ছাপা হয়। কোথা থেকে কিভাবে আসে কেউ জানেনা।

রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে একমনে লিখছিলেন তপনতনু। ওনার ডায়েরিটা খুব সুন্দর। চামড়ার বাঁধাই। সাদা লাইনটানা পাতায় কালো কালিতে লেখা অক্ষরগুলো রোদ্দুরে ঝক্‌ঝক্ করছিল।

"এখন আর সেভাবে লেখা আসেনা আমার। তবু টেবিলে বসি। যা পারি লিখি। শান্তর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই। ও জমা দেয় কুরিয়ারের অফিসে। ওরা নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। ছাপা হয়ে যায়। বাজারে আমার নাম কাজ করে। আমার বই বিক্রি হয়। তাই প্রকাশকরা আমার বই ছাপেন। আজকাল আমার আর সেভাবে অর্থের প্রয়োজন হয়না। শান্তর এনজিওতে বইএর পাওনা সব টাকাটাই আমি জমা দিয়ে দিই। ও কাজে লাগায়।

অথচ এই লেখা ছাপানোর জন্য একসময় কতকিছুর মধ্য দিয়ে গেছি। দেখেছি কিভাবে দুজন মানুষের প্রতিভা দুপথে যায়। কেউ গাছে চড়েন। কেউবা মাটিতে গড়াগড়ি খান। সবই কপাল! আমাকে কমবয়সে একজন বড় লেখক বলেছিলেন, "দাদা মামা নেই ? তাহলে মন দিয়ে মাটি খোঁড়। প্রতিভার ভরসা করো না। সবই কপাল। আর বসতে পারলে সিট ছেড়োনা। অন্যকে বসতে দিলে তুমি বসবে কোথায়।"

ওনার কথামত মাটি খুঁড়ে ঢুকেছিলাম। বসার সিট পেয়ে ছাড়িনি কাউকে। তখন আমার চারপাশে মধ্যমেধার মানুষেরা। হাততালি দেয়। স্তাবকতা করে। বেশ খুশি ছিলাম।

কিন্তু হঠাৎ একদিন মনে হল, ছাপানো তো হল অনেক। লেখা হল কই? একটা, অন্ততঃ একটা এমন লেখা লিখতে পারলাম না যা লোকে মনে রাখবে। আমি যখন থাকব না, কোনও লেখাটাই থাকবে না। সেইদিন থেকেই হতাশার শুরু। খুব অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম দিন দিন। সেসময়ে দেবের নার্সিং হোমে থাকাকালীন দেব শান্তর সঙ্গে আমার যোগাযোগ করে দেয়। ও এখানে আমাকে নিয়ে এল একদিন। তারপর আর ফিরিনি তো।

লোকে আমার খোঁজ করে। আমি তাদের কাছে নিরুদ্দেশে আছি। কিন্তু প্রকাশকরা জানেন আমি আছি কোথাও। হারিয়ে যাইনি।

বিয়ে না করার সুবিধে এতদিনে বুঝলাম। সেরকম আকুলি বিকুলি করার মত লোকজন নেই আমার। বাড়িঘর টাকাপয়সা সব দানপত্র করে দিয়েছি অনেক আগেই। তাই টাকার লোভেও মাছি ভনভন করে না। মাঝে একবার চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটেছিল, মিটেছে সেটাও। তবে ওতে ভাবনার কিছু নেই। ওরকম আমার মাঝেমাঝে হয়। জ্বর জ্বালার মত। আবার সামলে উঠি। এসব বোধহয় প্রতিভার লক্ষণ। এখন বেশ আছি।"

ডায়েরি লিখতে লিখতে একবার থামলেন তপনতনু। অনেকদিন বাদে আজ সকালে ভালমতন রোদ উঠেছে। খুরপি হাতে বাগানে খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে তার মনে হয়েছে নিজের কথা কিছু লিখে রাখা দরকার। কবে কখন ফট্ করে মরে যাবেন।

বারান্দায় বসে লিখতে লিখতেই তার নজরে এল শালু আর বলাকা কোথায় যেন যাচ্ছে। শালুর হলুদ পাঞ্জাবী আর বলাকার নীলশাড়ি বড় মিলেমিশে গিয়েছে। শালুকে তিনি খুব পছন্দ করেন । ওর সরলতা, গোয়াঁর্তুমি সবটাই খোলাখুলি।

তাকে দেখতে পেয়ে শালু একগাল হাসল।

"কোথায় যাচ্ছ?" তিনি জানতে চান।

তার উত্তরে বলাকা বলে "আজ শান্তদা মিটিং ডেকেছে লাইব্রেরিতে। সাড়ে পাঁচটায় শুরু। আপনি যাবেন না?"

"এইরে, একদম ভুলে গেছিলাম। যাব তো। তোমরা এগোও আমি আসছি।"

তপনতনু তার লেখাটা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে পোশাক পাল্টাতে ঘরে ঢোকেন। এখানকার মিটিং-এ যেতে তিনি পছন্দ করেন। কোনকিছু জানাব ভাবলেই, যে কেউ মিটিং ডাকতে পারে। তবে আজ মনে হচ্ছে বিষয় অত হাল্কা নয়। খুবই সিরিয়াস। একটু আগেই তিনি ডাক্তারবাবুকে যেতে দেখেছেন। সঙ্গে ছিল তুলসী। না ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে।

ডালে একটা হলুদ পাখি এসে বসেছে। অবাক হয়ে পাখিটাকে দেখছিল কুট্টি। পাখিটার নাম ও জানেনা। চোখদুটো কাজল টানা। চঞ্চল চোখে বার বার ঘাড় বেঁকিয়ে পাখিটা দেখছিল ওকে। পাখিটাকে দেখতে দেখতে অনেকদিন বাদে নীরুর কথা মনে হল কুট্টির। নীরু কী করছে এখন কে জানে ? আয়নাভেলিতে থাকাকালীন ওরা সপ্তাহে তিনদিন দেখা করত। গণেশ মন্দিরে, নয়ত গোদাবরীর তীরে কিংবা ভাঙা গীর্জার পাশে নীরু এসে দাঁড়িয়ে থাকত ওর জন্য। প্রতিদিন ও নীরুর জন্য নিয়ে যেত গাছের হলুদ অথবা লাল গোলাপ। পাখিটাকে দেখতে দেখতে আনমনে নীরুর গন্ধ পেল কুট্টি।

পাখিটা কেন এল? নীরুর কথা মনে করিয়ে দিতে?

আরো কত কিছুই তো মনে পড়ছে ওর। ওদের নার্সারির কথা। মাঠের পর মাঠ শুধু গোলাপের চারা, মুসুম্বির চারা, আর তার পেছনে মাথা তোলা লম্বা লম্বা নারকেল গাছের সারি। সেসব কীকরে ভুলবে ও? মা বাড়িতেই নারকেল তেল বানাত। নারকেলের আচার দিয়ে ভাত মেখে খেত ওরা। অভাব কাকে বলে জানত না ও। এও জানত না শুধু ধর্মের জন্য নীরু কোনদিন ওর হবেনা। হতে পারেনা।

কুট্টিরা মুসলিম, নীরুরা ক্রীশ্চান। কুট্টির ওপরে দুই দাদা। তাদের থেকে ও অনেকটাই ছোট। মা বেশ শক্ত সমর্থ, করিৎকর্মা ছিলেন। নার্সারির ব্যবসা মায়ের হাতে তৈরি। দূরে দূরে ট্রাকে করে গাছের চারা যেত। কালো প্লাস্টিকে মাটি দিয়ে চারা রাখা, তারপর সেগুলো গুছিয়ে ট্রাকে তুলে পাঠানো, সবটা করার জন্য অনেক লোক খাটত ওদের ব্যবসায়। সেসব সামলাতেন মা আর দাদারা। ওর জন্মের পরে বাবা মারা যাওয়ায় ওর ওপর মায়ের ভীষণ দুর্বলতা ছিল। ব্যবসার কোন কাজই ওকে করতে হত না। ও নিজের পড়াশুনো করত, ছবি আঁকত। মা শখ করে ওকে নাচে ভর্তি করেছিলেন। সেই গুরুজীর কাছে নীরুও নাচ শিখত। আর তখনই নীরুর সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হঠাৎ করেই প্রেমে বদলে যায়।

মাকে ওদের সম্পর্কের কথা বলেছিল ও। মা বলেছিলেন, "নীরুকে নিয়ে তুই পালিয়ে যা। রেজেস্ট্রি বিয়ে করে ফেরৎ আয়। আমি ওকে ঘরে তুলে নেব। কাউকে বলিস না কিছু। নীরুর বাড়ির লোক মানবে না। তোর দাদারা মানবে না। পালা তোরা।" প্রথমে রাগ করলেও, শুধু মা বুঝেছিল ওর কথা।

কিন্তু মার কথামত কিছুই হল না। নীরুর বাড়ির লোক জানতে পেরে ওকে পাঠিয়ে দিল কোথাও। সে জায়গার খোঁজ ও আজ অবধি পায়নি। নীরু বেঁচে আছে হয়ত। কিন্তু কিভাবে কোথায় আছে ও জানেনা। হয়ত ওর বিয়ে হয়েছে, হয়ত হয়নি। নীরুর জন্য এখনও ভাবে ও। ভাবনাটা ছেড়ে দিতে গেলেও ভাবনাটাই ওকে ছাড়েনা।

প্রথম প্রথম খুব অস্থির হয়েছিল। তখনই বিশ্বভারতীতে ভর্তির বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়ে। ভর্তির পরীক্ষায় পাস করে শান্তিনিকেতনে চলে আসে। কলাবিভাগের শেষ বছরে মার মৃত্যু ওকে নাড়িয়ে দেয় আবার। এই পথ চলাটা মাঝেমাঝে

ভারি অবাক করে ওকে। মানুষের সেবার কাজে এদিক ওদিক না গেলে শান্তদার সঙ্গে আলাপও হত না তো। পাস করার পর এলোমেলো জীবনে শান্তদার এনজিওর হয়ে অনেক কাজ করেছে ও। তখনই এই আরশিনগরে আসা। এখানে এসে আর ফেরার ইচ্ছে হয়নি।

শুধু শান্তদা মাঝেমাঝে ঝুঁটি ধরে নিয়ে গিয়ে এনজিওর কাজ করিয়েছেন।করেছে, আবার ফেরৎ এসেছে নিজের ভাঙা ঘরে।

বাড়িটা নিজেই খুঁজে বার করেছিল কুট্টি। এ নগরের শুরুতে জঙ্গল, শেষেও জঙ্গল। ও থাকে একেবারে শেষ প্রান্তে। সামনে পেছনে অনেকখানি জমি। বাড়িটা মোটেও ভালো না। কতদিনের পুরনো কে জানে। ভাঙা ঝরঝরে। খুব জোরে বৃষ্টি হলে ঘরে জল পড়ে। কিন্তু ওর জমিটা, বাগানটা খাসা। গোলাপ, গন্ধরাজ, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, যে সময়ের যা ফুল, যত্ন করে ফোটায় ও। শাক সবজিরও অভাব নেই। চিত্রাদি বলেছিলেন, "তোমার বাড়িতে ঢুকলে মনে হয় নার্সারিতে এসেছি।" সবাই আসে ওর বাড়িতে গাছের চারা নিতে। তখন ওর মার কথা মনে হয়। মা মারা যাবার পর, শেষবার যখন বাড়িতে ফোন করেছিল, দাদারা বলেছিল, "ফিরে আয়। তোর পড়া তো শেষ হয়ে গিয়েছে। তুই কোথায় আছিস, কেমন আছিস, জানা। আমরাই তোকে নিতে যাব তাহলে?" ও জানায়নি কিছু। আর ফিরেই বা কী হবে? জীবনটাকে লাটাই এর সুতো ছাড়ার মত ছেড়ে দিয়েছে সেই কবে। ওই সুতো আর টানবে না। ঘুড়ি যেখানে যাবে যাকনা। নবীনাদি মজা করে, আরো অনেকে ভাবে, শালিনীকে বুঝি ওর পছন্দ। ওরা জানেনা দুটো ভাঙা নৌকা যখন পাশাপাশি আসে, তখনও তারা টলমল করে। এক হতে পারেনা।

মা ওকে নাচে দিয়েছিলেন। বলতেন, "মেয়ে তো হলনা, ছেলেকেই নাচ শেখাই।" এই একটা আনন্দ ওকে দিয়ে গিয়েছে মা। যখন নাচে, তখনই একমাত্র ওর ক্ষতস্থানে ঠান্ডা মলমের প্রলেপ লাগায় কেউ। নীরুর মুখ, মার মুখ, মিলিয়ে যায় চোখের সামনে থেকে। এক আকাশ ঝলমলে তারার মিছিল দেখে ও। নানান মুদ্রা, নানা ভঙ্গিমায় ও যেন সেই আলোর বৃত্তে ঘুরপাক খায়, অনাবিল আনন্দে ভাসে। বাকি সব নীল অন্ধকারে ডুবে যায়।

শালিনীর কাছে আছে সেই রসদ, যা ওকে ভুলিয়ে দিতে পারে দিনরাতের যন্ত্রণা। তাই ওর কাছেই ও বারবার ছোটে, আর লোকের কৌতূহলের শরিক হয়। তবে এতেও একটা মজা আছে। ওরা ভাবে ও কিছুই বোঝেনা। কিংবা ও প্রতিবাদ করতে জানে না। সবটাই ভুল। আর সেই ভুলটাতেই পা দিয়ে ইচ্ছে করে বোকা সেজে মজা কুড়োয় ও।

মজার সঙ্গী আরো কেউ কেউ আছে। তারা হল রাস্তার বেওয়ারিস কুকুরছানাগুলো। কিছুদিন হল ওদের সঙ্গে ভারি ভাব হয়েছে ওর। ওদেরকে খাওয়ানোর দায় নিয়েছে ও। রাতে ওরাও থাকে বাড়ির উঠোনে। আজও মিটিং আরম্ভ হবার আগেই ওদের খাবারটা দিয়ে যেতে হবে। কুট্টি একটা গামলায় ভাত মেখে ডাকছিল কুকুরদের। ওরা আসছিল না। শালিনী ওর বাড়িতে এসে অপেক্ষা করছিল। মিটিংএ একসঙ্গে যাবে বলে একটু আগেই এসেছে আজ।

ও কুট্টিকে বলল, "অনেকক্ষণ বসে আছি, এবার আমি যাব। মিটিং শুরু হয়ে যাবে তো।"

কুট্টি ম্লান হাসে। "ঠিক আছে। তুমি যাও। আমি যাচ্ছি।"

কুকুরগুলো এসেছে শালিনী চলে যাবার পরে। কুট্টির পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল ওরা। দেশের বাড়ির কুকুরগুলোর কথা মনে পড়ছিল ওর। ওদের বাড়ির চারপাশে অনেক নারকেল গাছ। এখানে সেভাবে ওসব গাছ ও দেখতে পায়না। সেই নারকেল বাগানেই থাকত কুকুরগুলো ।

শান্তিনিকেতনে নাচ গান শেখা পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে চলে বলেই মায়ের কথায় ও শান্তিনিকেতনে ভর্তি হয়েছিল। ভারতনাট্যম শেষ করে সেতারের ক্লাস শুরুও করেছিল। ওর পাস করা আর মার চলে যাওয়াটা প্রায় একই সঙ্গে। কিছুদিন ওখানেই টিউশানি করে ও, তারপর শান্তদার সঙ্গে চলে আসে।

মাঝে মাঝে পুরনো দিন ঝাপটায়। সব ছেড়ে ছুড়ে আবার পথে নামার কথা ভাবায়। তবু আরশিনগরের মাটিতে কী যেন আছে। আঠা দিয়ে আটকে রাখে। ওইসব গোলাপফুল, গুঁড়ি গুঁড়ি কুকুরের ছানাদের না বলা কথা, কানে ভাসে। তাদের মিনতির ভাষা এক। আমাদের ছেড়ে যেও না যেন।

আজ আবার শান্তদা মিটিংএ ডেকেছেন। যাবে ও। নিশ্চয়ই তেমন কিছু বলার আছে। কদিন ধরেই হেনাদি, চিত্রাদি কেমন থমথমে হয়ে আছেন। শান্তদার মুখেও হাসি নেই। কিছু কী হল?

একটা জিনিস সার বুঝেছে ও, যেখানেই কিছু মানুষের মাথা এক হয়েছে, সেখানেই গোলমালের শুরু। আরশিনগরেও তাই হয়েছে নিশ্চয়। উড়ে যাওয়া পাখিদের দাঁড়ে বসালেই সমস্যার শুরু। দানাপানি দিতে হবে তো।

সব মিটিয়ে পথে যেতে যেতে ভাবছিল ও, কিসের মিটিং? কী বলবেন শান্তদা?"

# #

শান্তদা অপেক্ষা করছিলেন। কুট্টি এলে শুরু করলেন। মুখে হাসি নেই। কেমন একটা বিষণ্ণতার ছায়া মাখামাখি হয়ে আছে। আজ রবিবার। গতকাল রাতে নবীনাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তিনি। খুব বড়সড়ো সমস্যা না হলে এভাবে তার আসার কথা নয়। দুরকম গোলমালের আশঙ্কা করছেন। লোকরঞ্জনের লোক আসতেই পারে। সেক্ষেত্রে ঝুমুরকে নিয়ে যাওয়াই ওদের উদ্দেশ্য হবে।

আর সবচেয়ে বড় ভয়ের ব্যাপার অন্য জায়গায়। তারা যদি আসে? সেই জলপাই রঙের পোশাক পরা, মুখে গামছা আঁটা মানুষগুলো!

হনুমানের ল্যাজে আগুন ধরানো হয়েছে। লঙ্কা ধ্বংস না করে সে যায় কখনও।

সাড়ে পাঁচটায় একটু একটু করে অন্ধকার নামে। বড় বড় মোম জ্বালানো হয়েছে লাইব্রেরির হল ঘরটায়। লাইব্রেরির এই বড় বাড়িটা আগে হয়ত এ এলাকার ক্লাব ছিল। বড় হলটার পেছনের দিকে প্রমাণ সাইজের একটা স্টেজ আছে। স্টেজের সামনের মেঝেতে চেয়ার পেতে বসেছেন হেনাদি, চিত্রাদি আর শান্তদা। হেনাদির দিকে তাকায় ঝুমুর। চিত্রাদিকে নিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন শান্তদার পাশে। সামনের মেঝেতে বড় করে শতরঞ্চি পাতা। শান্তদার শহর থেকে এনে দেওয়া এই শতরঞ্চিতে যেকোন মিটিং হলেই সবাই বসে। আবার ঠাকুর বাড়ির প্রাঙ্গণেও এই শতরঞ্চিই পাতা হয়।

শান্তদা কথা শুরু করেন। নিস্তব্দ হলে তার গলার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে।

"আমরা এখানে প্রথম আসি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে। সর্বপ্রথম এখানে থাকতে আসেন হেনাদি। তারপর চিত্রাদি এসেছিলেন। পরে পরে আরো অনেকে। আমি আর তালিকা দীর্ঘ করতে চাইনা। তবে আমার এখানে আসা এনজিওর কাজের সূত্রে। সেদিন আবহাওয়া খুব খারাপ ছিল। এ পথে যেতে যেতে আটকে গেছিলাম আমি। আর গাড়ি চালাতে পারছিলাম না। তখন হেনাদির বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখে নক্ করি। উনি আমাকে ডেকে নেন। সেদিন আর আমার ফেরা সম্ভব হয়নি। ওনার বাড়িতে রাত্রিবাস করার সময় আমি জানতে চেয়েছিলাম, "এইরকম একজন একদম অপরিচিত মানুষকে বাড়িতে থাকতে দিচ্ছেন কী হিসাবে ?"

উনি তখন আমায় বলেছিলেন, "মানুষ হিসাবে। অন্য কোনও হিসাব আমার নেই আর। আমি সমাজের বাইরে চলে এসেছি। এই পড়ে থাকা বাড়িতে আছি। কেউ চলে যেতে বললে আবার কোথাও আস্তানা খুঁজে নেব। আমার সঙ্গে ভোলা নামের যে মানুষটি থাকে, সে এই অঞ্চলের লোক। সেই এই জায়গা আমাকে খুঁজে দিয়েছে। আমরা আসার পর আরো দুজন মহিলা এখানে থাকতে এসেছেন। আমাদের সবার মধ্যে মিল শুধু একটা ব্যাপারেই। আমরা তথাকথিত সমাজে আর বাস করতে চাইনা।"

শান্তদা থামতেই হেনাদি কথা শুরু করেন। "আমরা এখানে অনেকেই উপস্থিত আছি। যে কারণে আমরা আপনাদের ডেকেছি সে বিষয়ে চিত্রা আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে। তার আগে বলি, আমরা সকলে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছিলাম। শহরের স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে এই কঠিন জীবন যাপন করা খুব সোজা কথা নয়। সেটা আমরা পেরেছি একটাই কারণে। আসলে, আমরা সকলেই সমাজ সংসার ছাড়তে চেয়েছিলাম। চেনা লোকগুলোর মুখোমুখি হতে চাইনি। সমাজ ছেড়ে ঈশ্বরের সাধনা করতে চাইলে, মানুষ সাধু হয়। কখনও সবার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইলে আত্মহত্যা করে। এর কোনওটাই আমাদের করতে হয়নি এই আরশিনগরে আশ্রয় নেবার জন্য। আমার মনে হয় এখানের স্থায়ী সদস্যরা সকলেই এব্যাপারে একমত হবেন। কী ঠিক বলছি তো?"

সমবেত সমর্থনের ধ্বনি শুনে হেনাদি চুপ করে যান। চিত্রাদি উঠে দাঁড়াতেই তিনি নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়েন। চিত্রাদি একটুখানি চুপ করে থাকেন।

শান্তদা ওপাশ থেকে বলেন, "কী হল চিত্রাদি? অসুবিধা হল কিছু?"

"না। অসুবিধা হচ্ছে কঠিন কথাটা বলতে। রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে না? "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।" সেই গানটা মনে পড়ছে। এখানে আমরা বেশ ছিলাম। কষ্টে সৃষ্টে হলেও একেবারে নিজের শর্তে, নিজের মত করে। আমাদের পরে যারাই এখানে এসেছেন, পড়ে থাকা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন, সকলেই জানেন কী প্রচন্ড শারীরিক মানসিক শ্রম করেছি আমরা। আর এখনও করে চলেছি। কিন্তু এ পর্বের সমাপ্তি টানতে হবে।

এ জায়গার খোঁজ এতবছরে সেভাবে কেউ করেনি। কেউ এসে বলেনি, "তোমরা চলে যাও।" কিন্তু সবেরই শেষ আছে মনে হয়। নাহলে এভাবে গোলমাল শুরু হবে কেন? যেকোন সময়ে এখানে বাইরের খারাপ লোক ঢোকার ভয় আমরা পাব কেন? এখানে ভয় ঢুকেছে, আতঙ্ক শুরু হয়েছে। তাই এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। আপনাদের আমরা জোর করতে পারিনা। তবে আমরা এই আরশিনগর ছেড়ে চলে যাব স্থির করেছি। আপনারা এব্যাপারে কেউ কিছু বলতে চান ?"

ডাক্তারবাবু উঠে এসে চিত্রাদিদের পাশে দাঁড়ান। তারপর গম্ভীর স্বরে বলেন "না। আমি যাব না। এই আরশিনগর আমার দ্বিতীয় পৃথিবী। জোর করে কেউ সরিয়ে না দিলে আমৃত্যু আমি এখানেই থাকব।

হ্যাঁ। দরকার হলে একদম একাই থাকব।"

ডাক্তারবাবু বসে পড়ার পর একে একে সবাই উঠে এসে নিজের মতামত জানান। লাবনীর হয়ে নিরুপমাদি বলেন, "লাবনী কোনদিন এই আরশিনগর ছেড়ে যাবেনা বলেছে আমায়। আর আমিও যাবনা ওকে ছেড়ে।"

চিত্রাদি আর হেনাদি ছাড়া সবার এক মত। আরশিনগর ছেড়ে কেউ কোথাও যাবেনা। শান্তদা এখানে মাঝেমাঝে আসেন। নবীনাও ঘুরে চলে যায়। তাই ওরা কোনও মতামত দেয়নি।

এক এক করে বলা শেষ হলে আর একবার সবার মুখোমুখি হন শান্তদা। বলেন, "তাহলে আমার ইচ্ছেরই জয় হল। কেউ যাচ্ছেন না যখন, হেনাদিদের যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। আপনাদের আমি একটা নিরাপত্তার সংবাদ দিই। এখানে অনেকেই তাদের শেষ সম্বলটুকু সঙ্গে করে এসেছিলেন। তাদের অনেকেই বেশ অর্থবান ছিলেন। সেই অর্থ তারা আমার একটি ফান্ডে দান করেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট নামে ছাড়া এ্যাকাউন্ট খোলা যায়না। চিত্রাদি আর আমার যৌথ নামে অবশেষে এ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। আমরা টাকা তুলি, জমা দিই। কিন্তু হিসাবের খাতা খোলা থাকে সবার জন্য। কেননা ওই টাকাপয়সা খরচ হয় আরশিনগরের বাসিন্দাদের স্বার্থে। এই অঞ্চলের জমির বিষয়ে কোন সমস্যা হলে, অথবা এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে তার ব্যবস্থা ওই অর্থের সাহায্যে যতটা সম্ভব মেটানো হয়। দুঃখের কথা এই যে এখানকার সমস্যা অর্থ সংক্রান্ত নয়। সমস্যা বহিরাগতদের নিয়ে।

আজকের মিটিং শেষ করার আগে বলব, "আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার খবর আপনারা সকলে রাখেন না। কিন্তু দুর্যোগ নামলে সবাইকে যেন পাশে পাই।"

নবীনা প্রতিবাদ করে। "হেঁয়ালি রেখে একটু সোজা করে বলুন না।"

শান্তদা কথাটা শুনেও শোনেন না। "তাহলে আজকের মত এখানেই শেষ করছি ....।"

সবাই উঠে পড়ে। নবীনা দেখে মানুষগুলো লাইব্রেরির গেট খুলে বেরোতে বেরোতে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছে। ও ভাবে, এরা সব আরশিনগরের মানে দ্বিতীয় পৃথিবীর মানুষ। ও নিজেও কী তাই?

একেবারেই না। নবীনা এখনও দু নৌকায় পা রেখে টলমল করছে। শান্তদা ওর অবস্থান জানেন। তাই ওকে আরশিনগরে কোন ঘর দেননি।

আজকের মিটিংএ বিদেশ অনুপস্থিত। শমীকের তো আসার প্রশ্ন নেই। ভূষণদা কখনওই মিটিংএ আসেনা। আজ এসেছে। ঝুমুর আর মনুয়া আসেনি। নবীনার নিজেকে কেমন যেন বাইরের লোক মনে হচ্ছে। ও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল লাইব্রেরির গেটের সামনে। ঠিক করতে পারছিল না, কী করবে, কোথায় যাবে। ঠিক তখনই শান্তদা বাইরে বেরিয়ে এলেন। ওকে বললেন, "তুমি এক কাজ কর, ঝুমুরদের কাছে যাও। ভূষণ এখন ফিরবে না। লাইব্রেরিতে ওর কিছু কাজ আছে। এখন যা দিনকাল পড়েছে, ঝুমুরদের একা থাকা ঠিক নয়।"

কথাগুলো বলেই শান্তদা লাইব্রেরির হলে ঢুকে গেলেন। নবীনা একবার পেছন পেছন গিয়ে দেখল, হেনাদি, চিত্রাদি বসে আছেন চেয়ারে। একটু দূরে ভূষণদা সতরঞ্চি গোটাচ্ছে। হলঘরটায় বড় বড় কতকগুলো মোমবাতি জ্বলছে। আর তার আলোয় একটা আলো আঁধারি ভাব ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। শান্তদা গিয়ে চেয়ারে বসলেন।

নবীনা ফিরে পথে নামল। হাঁটা শুরু করল। ঝুমুরদের বাড়ির পথটা কে জানে কেন গুলিয়ে যাচ্ছে ওর। চারপাশে তেমন কেউ নেই। নবীনা যেতে যেতে টের পায় বৃষ্টি আসছে। টিপ টিপ ফোঁটা বড় হচ্ছে ক্রমশঃ। ও দৌড় শুরু করতেই বৃষ্টির বেগ বাড়তে থাকে। হঠাৎ নবীনার মনে হয়,সামনের সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। ও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু বিদেশের একটা ডাক ওর কানে ভেসে আসে। বিদেশ যেন ডাকছে ওকে, "নবীনা, ও নবীনা, এসো। আমাকে নিয়ে চল এখান থেকে।"

ঝুমুর চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছিল। মনুয়া পায়ে হাত ঘসছিল। চোখ খুলে নবীনা দেখল একটা মুখ ওর ওপর ঝুঁকে আছে। টিকালো নাকের নীচে মোটা গোঁফ, চশমার কাঁচে ঢাকা ঝকঝকে দুই চোখ, আশঙ্কিত দৃষ্টি। শান্তদা!

ওর একবার মনে হল দু' চোখ বুজে মুখটা দুহাতে নামিয়ে আনে আরো কাছে। নিজের মত স্বাদ নেয় ওই দিঘির মত গভীর স্নিগ্ধতার। পরক্ষণেই শিউরে ওঠে ও। কী অসম্ভব চিন্তা! কেউ টের পায়নি তো!

শান্তদা জানতে চান, "কী হয়েছিল? ঝুমুরদের বাড়ির ঠিক সামনেটায় পড়ে ছিলে কেন? আমি আর ভূষণ তোমায় দেখতে পেয়ে নিয়ে এলাম।"

নবীনা কোনরকমে বলে "জোরে বৃষ্টি এল তো। চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর কী হল খেয়াল নেই।"

"জোরে বৃষ্টি? কি জানি, আমরা ঘরে ছিলাম বলে হয়ত টের পাইনি।"

ভূষণ তর্ক করে, "না না। জোরে বৃষ্টি হয়নি তো। আমরা তো তখন লাইব্রেরিতে। টের পাবোনা কেন?"

শান্তদা গম্ভীর গলায় বলেন, "আঃ ভুষণ, নবীনা কি ভুল বলবে? হয়ত এদিকে জোরেই হয়েছে। যাই হোক নবীনা, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়, কেমন।"

রাতে দুটো বিস্কুট, আর একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিল ও। গুঁড়ো দুধের কৌটো দেওয়া হয় শান্তদার এন জিও থেকে। কাজে লেগে গেল। সেই দুধ একটু গরম জলে গুলে দিয়েছিল মনুয়া। ওদের এখানে থাকতে এসে বারবার নবীনা লক্ষ করেছে, মনুয়া সারাক্ষণ ছোট বোনের মত আগলে রাখে ঝুমুরকে। প্রায় সমবয়সী ওরা, একটু হয়ত ছোট ঝুমুর, কিন্তু ভারী কোনও কাজে বা রান্নার কাজেও ওকে মোটে ঘেঁসতে দেয়না।

এরকম মায়া পিসিমনি করে ওকে। মনুয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অভাবনীয়।

রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ায় ভোরের দিকে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে ঘুমটা ভেঙে গেল ওর। কিছু যেন ঘটেছে, অথচ ও জানতে পারেনি। শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে। তাকিয়ে দেখল, ওর হাত পা শক্ত দড়িতে বেঁধেছে কেউ। ওদিকে মনুয়াও গোঙাচ্ছে। ওরও সম্ভবতঃ একই অবস্থা। শুধু ঝুমুর নেই কোথাও। ঝুমুরকে কী লোকরঞ্জনের লোকেরা তুলে নিয়ে গেল?

# #

মীরাদির বাড়িতে এককোণে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল ঝুমুর। তখনও ওর কাঁপুনি থামেনি।

শমীক ওকে একগ্লাস জল দিল।

তারপর বলল, "শুকনো গামছা আছে, ভালো করে মুছে নাও। তুমি এখানে এলে কেন? আমাকে ওরা যেকোন মুহূর্তে ধরতে আসবে। তখন তোমার কী হাল হবে ভাবতে পারছি না। তোমাকে বাঁচাব কীকরে?"

"আমি কাল সকালেই চলে যাব। আজ রাতটা আমাকে এখানেই থাকতে দাও।"

"তুমি এলে কী করে? এই রাতে, তোমার ভয় করল না।"

"আরো বড় ভয়ের ঘটনা ঘটেছে তো। আজ নবীনাদি থাকায় ভূষণদা বাসন্তীবালার বাড়িতে থেকে গিয়েছে। ওখানে নাকি রাতে ভক্তিগীতির আসর বসবে। বয়স্ক মানুষ, আমরাই রাতে ফিরতে বারণ করেছি। তখন দুটো বাজে। আমি বাথরুমে যাব বলে উঠে দেখি দুজন লোক পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল। ওরা হয় আমাকে নয় তোমাকে ধরতে এসেছে। অন্ধকারে মুখও দেখা যাচ্ছে না। আমি তখনই কোনও কথা না ভেবে খিড়কির দরজা দিয়ে এখানে চলে এসেছি।"

শমীকা তাকায় ওর দিকে। "আমি একা হলে সামনাসামনি যা হত বুঝে নিতাম। তুমি এসেছ, তোমাকে নিতেই যদি ওরা এসে থাকে, এত সহজে ছেড়ে দেবে না। ওঠো। ওরা খুঁজবে তোমায়। এখানেও ওরা হানা দিতে পারে। চল, আমাদের পালিয়ে কোথাও লুকোতে হবে।"

শমীকের বাড়ানো হাত ধরে ঝুমুর ওঠে। পায়ে কোনও জোর পাচ্ছেনা ও। তবু মনের জোরে এগোয়।

দিনের আলো ভালো করে ফোটা অবধি জঙ্গলের ঝোপে লুকিয়ে বসেছিল ওরা। তারপর যে যার বাড়ি ফিরে যায়। কুকুরগুলো মাঝে একবার জোর চিৎকার শুরু করেছিল। ভয় পেয়েছিল ঝুমুর। যদি ওদের কাছে আসে, ঝামেলা শুরু করে। তারপরে বুঝতে পারল ওরা নয়। হয়ত সেই সময়েই ওই লোকগুলোর মুখোমুখি হয়েছে কুকুরগুলো। আর অচেনা মানুষ দেখে চেঁচিয়েছে।

বাড়ি ফিরে ঝুমুর দেখল মনুয়া গম্ভীর মুখে চা বানাচ্ছে। আর নবীনাদি বসে আছেন। চুল এলোমেলো। চোখে চশমা নেই। ওকে দেখে দুজনেই ছুটে এল। মনুয়া চিৎকার করে বলে,"এসেছিস? আমরা খুব ভয় পেয়েছিলাম।"

ও শমীকের বাড়ি গিয়েছিল শুনে গোলমালের মধ্যেও মনুয়া ফিস্‌ফস্ করে, "জামাইবাবু কী বলল রে?"

নবীনাদি খুব ভয় পেয়েছে, মনও খুব খারাপ। বিষণ্ন ভাবে ওকে বলল, "তোকে বোধহয় বাঁচাতে পারলাম না। ওরা এখানেও হানা দিল? আমি শান্তদাকে সব কথা বলতেই যাচ্ছিলাম। মনুয়া চা খেয়ে যেতে বলল।"

নবীনাদি চলে গিয়েছে। শান্তদাকে সব জানাবে বলল। মনুয়া একবার বলেছিল, "ওরা শমীকের খোঁজে আসেনিতো? আমরা তো জানিনা, কারা এসেছিল। কোন কথাও তো বলেনি। মনে হয়, ঘুমের ওষুধ স্প্রে করেছিল। নাহলে হাত পা বাঁধার সময় বুঝতে পারতাম।"

নবীনাদি কথাটা মানতে চায়নি। বলেছে, "কখনও না। শমীকের খোঁজে ওরা এলে আমাদের প্রশ্ন করত। দলবল নিয়ে ভাঙচুর করত। এত সহজে চলে যেতনা। তাছাড়া ওদের পোশাক? শুধুমাত্র দুটো লোক সাদা পোশাকে আসবে কেন? এরা লোকরঞ্জনের ভাড়া করা লোক। তাই এমন ছিঁচকে চোরের মত আচরণ।"

কথাটা যে ভুল নয় সেটা ঝুমুরও বুঝেছে। লোকরঞ্জনের লোক এতদূর এল কেন? আসলে ও যে ওদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে এসেছে, সেই অপমানটা নিতে পারেনি লোকটা। ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দিতে চায়। নাহলে এভাবে নবীনাদিকে ফলো করে এতদূর চলে আসত না।

নবীনাও যেতে যেতে একই কথা ভাবছিল। অধিকার। আধিপত্য। তারপরে বশ্যতা।

মেয়ে হয়েও ওই সোজা রাস্তায় ঘুঁটি চালতে দেয়নি ওরা। তাই ওর বর বিদেশ থেকে ছুটে এসে ওকে ভয় দেখাতে চায়। লোকরঞ্জন লোক ভাড়া করে ঝুমুরকে ধরে নিয়ে যাবে ভাবে।

শান্তদা সব কথাই শুনলেন। তার কথাতেই মনুয়া আর ঝুমুর অন্ধকার নামতেই এসে পৌঁছল হেনাদির বাড়ি। শমীক আসবে আরো পরে। ওদের নিয়ে যাবেন শান্তদা। ওরা না চলে গেলে নিত্যদিন একটা না একটা ঝামেলা লেগেই থাকবে আরশিনগরে। তাতে ওদেরও বিপদ হবার ভয় আছে।

তাছাড়া আরশিনগরকেও বাঁচানোর আর কোনও পথ নেই।

নবীনা বাড়ি ফিরে এসেছে। বিদেশকে ও নিয়ে এসেছে নার্সিংহোম থেকে। নবীনার বাড়িতেই আছে বিদেশ। মাঝেমাঝে নবীনাকে বলে, "আজ ছেলের সঙ্গে দেখা করে এলাম। ভাবছি এবার চলে যাব ওদের কাছে। ওখানেই থাকব। তুমি মনখারাপ করো না নবীনা। মাঝেমাঝে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

শান্তদা বলেছিলেন দেবকে, বিদেশকে নার্সিংহোমেই রেখে দিতে, যা খরচা লাগে উনি দেবেন। কিন্তু দেব সে প্রস্তাবে রাজি হননি। বলেছিলেন, "যে রুগীর চিকিৎসা হচ্ছেনা, তাকে কী করে রাখব? এরকম কোন নিয়ম নেই তো। ম্যানেজমেণ্টকে আমি কী জবাব দেব? তাছাড়া ও এখন মানসিক রুগী। ওকে মেন্টাল হসপিটালে রাখতে হবে।"

শান্তদা খুব দিশেহারা হয়ে পড়েন। কোথায় রাখবেন ওকে? নিজের কোনও সংসার নেই। আরশিনগরের হেনাদিদের বয়স হয়েছে। ওদের কাছে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। ওখানে ওকে একাও রাখা যাবেনা। তাছাড়া হাসপাতালে না রাখলেও মাঝেমাঝে ওকে নিয়ে গিয়ে মনের ডাক্তার দেখাতে হবে। সেটা শহরে রাখলেই সুবিধে। নাহলে ওর রোগ বেড়ে যাবে।

নবীনা তখন বিদেশকে নিজের কাছে রাখার প্রস্তাব দেয়। শান্তদা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিমাসে কিছু টাকা খরচ হিসাবে দেবার প্রস্তাব দেন। নবীনা বলেছিল, "একটা মানুষকে খাওয়ানোর ক্ষমতা আমার আছে। ওর অন্যান্য খরচ বা চিকিৎসার দায় আপনি নিতে পারেন। আমি বারণ করছি না।"

বিদেশের শরীর একদম ঠিক আছে। বাহ্যিক আচরণ মোটামুটি স্বাভাবিক। শুধু চিন্তা ভাবনাটা একই বৃত্তে ঘুরপাক খায়, ছেলে আর বউকে ঘিরে । যাদের কাছে ও যায়, ভালবাসার আদানপ্রদান হয়, আবার ফিরে আসে। ওকে এখন বাইরে একদম একা ছাড়া যায়না। মাঝেমাঝে ওকে পার্কে ঘুরিয়ে আনে নবীনা।

দেব বলেছিলেন, "দিনদিন ওর ভুলে যাওয়ার মাত্রা বাড়বে। একসময় সবকিছু ভুলে যাবে। তখন আর বাড়িতে ওকে রাখা যাবেনা।" নবীনা অতটা ভাবেনা। সবকিছু কী ওরই হাতে আছে?

নবীনাকে প্রায় প্রতিদিন স্কুলে যেতে হয়। তখন নমিতা আর পিসিমনি সামলায় ওকে। পিসিমনি মাঝেমাঝেই নিজের মনে গজ্‌গজ্‌ করে। "কোথাকার কে? তাকে নিয়ে এসে ঘাড়ে বসাল। কতকরে বললুম, শুনল না। এবার বোঝ!"

নবীনা অবাক হয়ে দেখে ওরকম বললেও পিসিমনি যত্ন করে বিদেশকে খেতে দিচ্ছে। দুপুরে স্নান করতে না চাইলে, ভুলিয়ে ভালিয়ে স্নানে পাঠাচ্ছে। কাজের মেয়ে নমিতাকে দিয়ে বিদেশের ঘরদোর, জামাকাপড় টিপ্‌টপ্‌ করে রাখছে।

নমিতাকে নবীনা অতিরিক্ত কাজের জন্য পয়সা দেয়। কিন্তু পিসিমনিকে ও কী দেবে? এমনি এমনি পিসিমনি ওর জন্য অনেক করেছে, এখন বিদেশের জন্য করে। তাই পিসিমনির মুখের কথাকে ও তেমন গুরুত্ব দেয়না।

শান্তদার কাছে নবীনা জেনেছিল, ঝুমুর আর মনুয়া ভাল আছে। ওদের শান্তদা আরামবাগের দিকে একটা হোমে রেখেছেন। সেখান থেকে প্রাইভেটে ওরা বোর্ডের পরীক্ষা দেবে। মাঝে ঝুমুরের একটা চিঠি এসেছিল নবীনার নামে। ওরা ঠিক্‌ঠাক্‌ আছে। পড়াশোনার শেষে আবার আরশিনগরে ফিরতে চায়।

শমীককে গুরগাঁওয়ে একটা চাকরি করে দিয়েছিলেন শান্তদা। ও ওখানেই আছে। ঝুমুরদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে ফোনে ও কথা বলে।

ওরা চলে যাবার পরে আরশিনগরে একবার যাবার চেষ্টা করেছিল নবীনা। সেদিন আকাশ ছিল পরিষ্কার। ট্রেনে করে গিয়ে বাসে চেপে ও নেমেছিল জঙ্গলের সামনে। ঠিক তখনই একরাশ কুয়াশা এসে ঘিরে ধরে ওকে। একদম সাদা নয়, এ কুয়াশার রঙ কেমন ঘোলাটে। কুয়াশায় ঢাকা সামনের পথ একেবারে ঝাপসা। ও কিছু দেখতে পায়নি। ফিরতি বাসে ফেরত আসে।

বেশ কিছু পরে একদিন শান্তদা বলেছিলেন ওকে, "আরশিনগর যাব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে নাকি? হেনাদি, চিত্রাদি তোমার কথা বলছিলেন। বিদেশকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।"

ও যায়নি আর। অভিমান হয়েছিল খুব। যে আরশিনগর ওকে ফিরিয়ে দেয়, তার কাছে ও আর কোনওদিন ফিরে যেতে চায়না।

এখনও মাঝেমাঝে ও স্বপ্নে দেখে আঁকাবাঁকা এক পথ বনের মাঝে ঢুকে গিয়েছে। সেই পথ মিশেছে বালি কাঁকরে ভরা নদীতে। পায়ে হেঁটে নদী পেরোলেই আবার পথচলা। বাঁশি ধরা দুটি হাতের চিত্রলিপির সামনে গিয়ে একটু থামা।

তার পাশ দিয়ে আবার পথ এঁকেবেঁকে চলে যায়। কোথায় যায়? সেকি আরশিনগরে? তবে স্বপ্নে সবটুকু আবছা থাকে। স্পষ্ট হয়না।

নবীনা এগিয়ে যায়। বাদামী কুয়াশা ঠিক তখনি এসে ঢেকে দেয় পথঘাট। নবীনার কান্না পায়। এবারেও হলনা। ও ফিরে আসে। ঘুম ভেঙে যায়।

নবীনা মনেমনে জানে একদিন ঠিক ডাক আসবে, আর কুয়াশা সরে গিয়ে ওকে পথ দেখাবে। ওর নিরুদ্দেশ যাত্রা শেষে, ও পৌঁছে যাবে সেই স্বপ্ননগরীতে।

# #

(সমাপ্ত)

ঐতিহ্যময় শহর চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা **সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়** বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতক। ১৯৯৬ সালে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় "দিবারাত্রির কাব্য" পত্রিকায়। ২০০১ সালে "দেশ" পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। 'আনন্দবাজার', 'বর্তমান', 'আজকাল', 'প্রতিদিন', 'তথ্যকেন্দ্র', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছাড়াও, 'অনুষ্টুপ', 'কুঠার', এবং 'মুশায়ারা'-র মতো বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনেও তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা অব্যাহত। প্রকাশিত উপন্যাস পাঁচটি, গল্পগ্রন্থ তিনটি, এবং কবিতার বই একটি।

ধারাবাহিক

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ১৭

নীল আস্তে আস্তে জয়িতার মাথাটা নিজের বুকে গুঁজে নিল । তার বুকের কাছটা এখন ভিজে চুর হয়ে আছে জয়িতার কান্নায় । নীল একটাও শব্দ উচ্চারণ করল না । কাঁদুক, এখন জয়িতার একটু কাঁদবার সময়, কেঁদে-কেঁদে একটু হালকা হোক মেয়েটা । মাঝে-মাঝে মানুষকে তার নিজস্ব ইচ্ছায় কাঁদতে দিতে হয় । সব কান্নার ধরণ এক হয়না, কান্নাদেরও রকম ফের থাকে । কিছু অশ্রু থাকে যাদের গলা টিপে না মারা অবধি মনের স্বস্তি থাকেনা । কিছু অশ্রু থাকে যাদের সহজেই পোষ মানানো যায়, কিন্তু চোখের খাঁজে খাঁজে কিছু জলবিন্দুরা থাকে, যারা দামাল, তারা মুক্তিকামী, তাদের বুকের মধ্যে ধরে রাখলে বুকের কষ্টও বাড়ে, কান্নারও । এমনই এক কান্না কাঁদছে এখন জয়িতা । জয়িতা সব জানতে পেরে গেছে মনে হয় । জয়িতা যে বুঝতে-জানতে পেরেছে সবটাই তা নীল বেশ কিছুদিন আগেই বুঝেছে । রাতের পর রাত ছটফট করেছে মেয়েটা, উঠে বসে চলে গেছে জানালার ধারে, সন্তর্পণে জানালা খুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি খুঁজেছে জয়িতা ? রাতের আকাশ তো জয়িতার স্বাভাবিক চারণভূমি নয়, ও তো নীলের জন্য সংরক্ষিত । তবে কি মৃত্যুর আগে মানুষ দার্শনিক হয়ে ওঠে ? জয়িতা কি নিজের জন্য এক চিলতে স্থান চিহ্নিত করে রাখছে ওই আকাশের গায়ে এইসব রাতে ? ওই রাতগুলোয় জয়িতাকে বিরক্ত করেনি নীল । মেয়েটাকে নিজের সমস্যার সঙ্গে নিজেকে যুঝতে দিয়েছে । কাল রাতটাও প্রায় জেগেই কাটিয়েছে জয়িতা । নীলেরও ঘুমের গাঢ় ভাবটা এখন কমে এসেছে । জয়িতার যাবতীয় বিচলন সে টের পায় । তবু চুপ করে শুয়ে থাকে । আজ ভোরের দিকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল নীল । জয়িতা এখন সারা রাতের যুদ্ধ শেষে বড় নির্লিপ্ত ঘুমোচ্ছে । একটা শান্ত ছায়া ওর মুখ জুড়ে । বড় মায়া করে উঠেছিল নীলের সেই মুহূর্তে জয়িতার জন্য । জয়িতার মাথাটা নিজের বুকে তুলে নিয়েছিল সে । আর তখন থেকেই নীলের বুক ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল জয়িতার চোখ দুটো । বেশ কিছুক্ষণ পরে নীল নরম স্বরে ডাকল, ''জয়ি'' জয়িতা আর তিন চার মিনিট নিল নিজেকে সামলাতে । ধীরে ধীরে খাটের উপর উঠে বসল নীলের মুখোমুখি, তারপর খুব শান্ত স্বরে কথা বলতে শুরু করল, এমনভাবে যেন একটু আগে অন্য কোনও একটা মানুষ কাঁদছিল, ''নীল, তুমি এবার সংসারের খুঁটিনাটি গুলো বুঝে নিতে শুরু কর । আমি চলে গেলে তখন মুশকিলে পড়ে যাবে'' ।

নীল তড়িঘড়ি কথাটাকে ধামাচাপা দিতে চাইল, ''কি উল্টোপাল্টা বকছ জয়ি ? তুমি ভালো হয়ে যাবে । তুমি ....''

— ''অ্যাই নীল, আমি বুঝি ছেলেমানুষ আর তুমি আমার বুড়ো ঠাকুর্দা ।'' জয়িতা ভীষণ মিষ্টি করে হাসে, আমি সব বুঝি গো নীল মশাই, সব । এইচ আর সিটি থোরাক্স হল, ব্রংকো বায়োপসি হল, ডাক্তারবাবু স্টেজ থ্রি বলে দিলেন, চুল উঠে উঠে তোমার বউটা টেকো হয়ে গেল কেমো নিতে নিতে, এত বুঝি আর এ'টুকু বুঝিনা যে আমার হাতের দিনগুলো আর বছরে নয়, মাসে গুনতে হবে । জানো নীল, মরে যেতে আমার কোনও দুঃখ নেই । শুধু পাপানটার জন্য বড় মন কেমন করবে । ইস্ মেয়েটাকে আর দেখতে পাবোনা । আর মা'টা ও — সন্তানশোক বড় কঠিন নীল ।

''জয়ি, প্লিজ'', নীল অনুনয় করতে গিয়ে এর বেশী আর শব্দ খুঁজে পায়না । নীলের সকালটা খুব দ্রুত অন্যরকম হয়ে আসছে ।

— ''না গো, আমায় বলতে দাও । তবে জানো নীল, যাওয়ার আগে একটা খুব বড় জিনিস সঙ্গে নিয়ে চললাম । কি বলো তো সেটা ?'', কৌতুকে জয়িতার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে থাকে । নীল বিস্মিত হয়, ''কি ?''

— ''তোমার ভালোবাসা গো, তোমার ভালোবাসা । মাঝে মনে হত, তুমি বুঝি আমাকে আর তেমন ভালোবাসো না । উফ্, কত সতীনই যে ছিল আমার একের পর এক । তোমার কাজ, তোমার লেখার জগৎ, মনে-মনে শিঞ্জিনিদি । খালি মনে

হত, তুমি এদের নিয়েই ব্যস্ত, আবার কোনও জায়গা আর তোমার জীবনে নেই । আজ বুঝি, ভুল ভাবতাম । আমার জায়গাটা আমারই ছিল, সেখানকার আমিই জমিদার । না অন্য মানুষ সেখানের দখল নিতে, না তো তুমি সেখানকার সত্ব অন্য কারও নামে লিখে দিয়েছিলে । তুমি, শুধু তুমিই বা কেন, প্রতিটা মানুষই আসলে একটা গোটা সাম্রাজ্যের মত, তাতে সে মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা, অন্য মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা, অন্য মানুষ ও অভ্যাসেরা জমিদার, ছোট ছোট ভূখন্ডের অধিপতি । এই আমার জীবনই ধরো না কেন । আমি যে তোমায় এত ভালোবাসি, আবার পাপানকেও তো বাসি, মা-কে বাসি, এমন কি জানো নীল, আমি শিঞ্জিনিদিকেও বেশ ভালোবাসি । ওকে তেমন ভালোবাসার কথা আমার নয়, তবুও, অনেক ভাবে দেখেছি ওকেও আমি ভালোই বাসি'' ।

— ''তুমি যে বড় ভালো জয়ি, খুব ভালো মনের একজন মানুষ । জয়ি, তুমি এতটা ভাবতে পারো, নিজেকে একটু নেড়ে-চেড়ে সবাইকে দেখালেনা কেন ? কেন তুমি ছোট্ট এক গন্ডির মধ্যে আটকে রাখলে নিজেকে ?''

জয়িতা হেসে ফেলল । দক্ষিণ দিকের খোলা জানালাটা দিয়ে বেশ শান্ত একটা হাওয়া আসছে । জয়িতা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো পুবের জানালাটা দিয়ে হালকা একটা আলো এসে পড়ছে ওর বাঁ গালে । মাথায় এখনও টিকে থাকা চুলগুলো এদিক ওদিক উড়তে চেয়ে আলগোছে পড়ছে ওর কপালে । কালো হয়ে আসা শরীরটা অপার্থিব লাগল নীলের । কথা বলতে এখন আর ভালো লাগছে না তার, নিজের করা প্রশ্নের জবাব পেতেও নয় ।

জয়িতাই আবার কথা শুরু করল, ''আসলে, নিজেকে যে তোমার মধ্যে স্বেচ্ছায় বেঁধে দিয়েছিলাম । আমি অন্য কোনও আকাশে নিজের মুক্তি চাইনি নীল । আমার সব বন্ধন তোমার জীবনের সঙ্গেই জুড়েছিল, সব মুক্তিও । তোমার মতো একজন মানুষকে । নিজের জীবনে পেয়ে আর ডানা ছড়াতে ইচ্ছা করেনি আমার কখনও সেভাবে । মনে হয়েছিল এ'ভাবে তোমাকে জড়িয়েই কাটিয়ে দেব জীবনটা । আমার যেন সে ভাবনাতেই শান্তি ছিল, তৃপ্তি ছিল । আমার চাওয়াও তুমি ছিলে, পাওয়াও তুমিই'' ।

— ''জয়ি, আমি তোমায় খুব ভালোবাসতাম, আজও বাসি । হয়তো ভালোবাসা বলতে আমি যা বুঝি, তুমি তা বোঝোনা তবু তোমাকে তোমার মতো করে আমি খুব ভালোবাসি জয়ি'', নীলের স্বর কাঁপতে থাকে ।

জয়িতা নিজের মাথাটা আলতো করে নীলের কাঁধে রাখে, খুব আস্তে বলে, ''জানি তো'' ।

হঠাৎ নীল দু'হাতে জয়িতাকে আঁকরে ধরে । হু হু করে কাঁদতে থাকে নীল, ''তুমি আমাকে ছেড়ে এ'ভাবে চলে যেওনা জয়ি, এভাবে আমাকে একলা ফেলে — আমি তোমায় ছাড়া বাঁচবো না জয়ি, আমি ভালো থাকবো না ।'' নীল বলে যেতেই থাকে, ''প্লিজ, তুমি আমায় ছেড়ে চলে যেওনা, প্লিজ । তুমি বলো, আমায় কি করতে হবে, আমি সব করবো, তুমি বলো জয়ি, কি চাও তুমি আমার কাছে ? আমি সব দেবো, সবটা ।

জয়িতা নীলের কাঁধের থেকে বুকের দিকে মুখ সরাতে সরাতে বড় স্মিত স্বরে বলে, ''এরপর বুঝি একটা মেয়ের আর কিছু চাওয়ার থাকতে পারে বোকারাম ।''

তারপর নীলের বুক থেকে মুখ তুলে সরাসরি নীলের চোখে চোখ রাখে জয়িতা, নীলের চোখ আর গালে জমে থাকা জলগুলোকে আঙুল দিয়ে অদৃশ্য করতে করতে হঠাৎ ভীষণ আদুরে গলায় জয়িতা বলে ওঠে, ''আই নীল, আমায় একটা চুমু খাবে ? ভীষণ ভীষণ ভালো একটা চুমু ?''

# # #

শীর্ষ নিজের পায়ের চলায় নিজেই অবাক হয়ে গেল । কলকাতা শহরটা একটু আগে আবছা হতে শুরু করেছে । হেমন্তের কুয়াশা আর দূষণের ধোঁয়া মিলে-মিশে একটা ধূসর চাদর গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে শহর কলকাতার । রাস্তার হলদেটে উজ্জ্বল আলোদের চোখগুলোও যেন কিছুটা বিষণ্ন । কলকাতা শহর বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে গুটি গুটি পায়ে । এই সময়ে

সারা শহরের ব্যতিক্রম হিসাবে এই জায়গাটা ক্রমশই জেগে উঠতে শুরু করে। মানুষদের আনাগোনা, চাপা উল্লাস, সশব্দ প্রত্যাখান আরও হাজার আপতঃ অবশ্যক ও অনাবশ্যক কথাবার্তায় রূপ খুলতে থাকে সোনাগাছির। কিছু মেয়ে, চোদ্দ থেকে চৌতিরিশ, অদ্ভুত সব রঙ ও গন্ধের প্রসাধন মেখে, চোখে লাগার মত উজ্জ্বল পোশাকে দাঁড়িয়ে পড়ে সোনাগাছির অলিতে গলিতে এমন কি সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর উপর পেট্রোল পাম্প আর ব্যাটারির বড় দোকানটার আশেপাশে। উৎসাহী মানুষেরা এইসময় তাদের কাছে আসতে থাকে, দরাদরি শুরু হয়, খাটনি আর দরে মিল হলে সংকীর্ণ গলির ততোধিক সংকীর্ণ কোনও ঘরে শরীরের দেওয়া-নেওয়া। মানুষ পাঁঠার মাংস, মুরগীর মাংস কিনতে গিয়ে দরাদরি করেনা, নারী শরীর ভোগের আগে দরাদরি আবশ্যক, যদি কিছু কম দামে চরিতার্থ করে নেওয়া যায়। এই সব মেয়েগুলোও ধীরে ধীরে মানুষ থেকে যন্ত্রের দোকানে পরিণত হয়ে গেছে। উপযুক্ত ভাড়া পেলে যান্ত্রিকতায় সারা দেহ ব্যবহার করতে দেয়। যেমন বা যতটা ব্যবহার করবে, ভাড়া তেমনই। তবু সমস্ত ব্যবসার মত, পৃথিবীর এই আদিমতম ব্যবসাতেও গুন্ডা ও প্রশাসনের নিখরচায় অধিকার। পুলিশ আর দাদারা ইচ্ছা করলেই এইসব মেয়েদের শরীরে হাত দিতে পারে, টেনে নিয়ে যেতে পারে বিছানায়, সমাজের চোখের সামনে এতবড় ব্যবসা চালানোর কর হিসাবে।

রুমকিটা মারা যাওয়ার পর থেকে মন-মেজাজটা একদম ভালো যাচ্ছেনা শীর্ষর। কোনও কিছুই ভালো লাগেনা। খালি, রুমকিটাকে মনে পড়ে যায়। না, রুমকির মুখটাই যে সবসময় খুব স্পষ্টভাবে মনে পড়ে, তা নয়, মুখ মনে করতে গেলে বরং রুমকির মরা মুখটাই বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বেশী করে মনে পড়ে রুমকির কথাগুলো, রুমকির একসময়ে শীর্ষর জীবনে জড়িয়ে থাকাটা। নীলদা, শিঞ্জিনিদিরা আসে মাঝে মাঝে, নীলদাকে বলতে বলেছিল, এটাই ভালোবাসা। শীর্ষর বিশ্বাস হয়নি, ভ্যাট, ও'সব ভালোবাসা টাসা নীলদাদের মতো মানুষদের জন্য, শীর্ষর মনে হয় অমন ভালোবাসা নীলদা-শিঞ্জিনিদির মধ্যে আছে, শীর্ষদের জন্য নয়। শেষমেশ এক চ্যালাই ধরে এনেছিল একদিন শীর্ষকে এই পাড়ায়, বিউটি মেয়েটার ঘরে। শালা, এ' মেয়ের নাম নাকি বিউটি ? কালো গায়ে রঙ চড়িয়ে কেমন বেগুনী হয়ে আছে, নাক চোখ খারাপ নয়, তবে বিউটি বলবার মতো তো নয়, বয়স ২২-২৩ হবে বোধহয়। তা ওই বিউটির সঙ্গে শোয়-টোয়নি শীর্ষ। বসে বসে মাল খেয়ে চলে এসেছিল খালি। দু'দিন পরে এক সন্ধ্যায় শীর্ষ হঠাৎ অবাক হয়ে দেখেছিল, তার বিউটির কাছে যেতে ইচ্ছা করছে। চলেই গিয়েছিল সেদিন। সেদিনও ওই মদ খেয়েই চলে এসেছিল, শুধু আসবার সময় কি মনে হতে বিউটিটাকে একটা চুমু খেয়ে এসেছিল।

শীর্ষ অবাক হয়ে গেল। আজ ঠিক আবার একদিন পরে সে কেন এসে দাঁড়িয়েছে এই গলিতে ? বিউটির জন্য তার মন কেমন করছে ? ভাবলে তো শালা নিজেরই হাসি পাচ্ছে। তাহলে কি তার শরীর চাইছে বিউটিকে, রুমকির কথা ভেবে কোথাও আটকে যাচ্ছে ? দুর অত সাত পাঁচ ভাবতে ভালো লাগেনা শীর্ষর সে পা চালাল বিউটির খুপরির দিকে।

# # #

— ''আজকে এলে ? আজকে শরীরটা ভালো নেই কিন্তু। সকাল থেকে টিসটিস করছে। আজ কিন্তু পারবোনা বাপু'', বিউটি কথাগুলো বলবার ফাঁকে-ফাঁকেই শীর্ষ লক্ষ্য করল, সত্যিই বিউটি আজ রংচং মাখেনি। রংচং না মেখে মেয়েটার কালো মুখটা কেমন যেন খড়ি ওঠা হয়ে রয়েছে, বুড়ি বুড়ি লাগছে। শালা, এত সস্তার রং দিন রাত্তির মাখে বলেই মুখের চামড়া অত খসখসে।

''বাজে বকোনা। আমি তোমার ঘরে কিছু করতে আসিনা। তা আজ তোমার ঘরে বসে মাল খাওয়াও বারণ নাকি ?'' শীর্ষ কাটা কাটা কথাগুলো ছুঁড়ে দেয়।

''তা ঠিক, তুমি তেমন ছোঁও-টোও না'', বিউটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শীর্ষকে জরিপ করতে থাকে, ''কিন্তু কেন ?''

— ''ভালো লাগেনা তাই'' শীর্ষ অবহেলায় উত্তর দিতে দিতে সোজা হয়ে বসে, ''অ্যাই তুমি কি ভ্যানতাড়াই মারতে থাকবে নাকি মালটা ঢালবে এবার গ্লাসে ?'' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শীর্ষ আবার শুরু করে, ''অ্যাই তোমায় মাল দিতে বললাম না ? কি দেখছো, হ্যাঁ ?''

— ''তোমাকে'', দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে বিউটি উত্তরটা দেয়।

— ''নখরাবাজি বন্ধ করে আসল কাজটা করো তো'', বিরক্ত হয়ে যায় শীর্ষ।

— ''না গো সত্যি বলছি, তোমাকেই দেখছি। একটা কথা বলব ?'' বিউটি খাটের ধার ঘেঁষে বসে, ''জানো, আগের দিন তুমি যাওয়ার সময় একটা চুমু খেয়ে গেলে না, খুব ভালো লেগেছে জানো। এখানে যে খানকির বাচ্চাগুলো আসে, সেগুলো তো সব মাংস চুষতে আসে। চুমু তো খায় না, কামড়াকামড়ি করে। তোমারটায় খুব আদর ছিল জানো ?''

— ''এমন কথা আজ পর্যন্ত কতজন খদ্দেরকে বললে, হিসাব আছে ?'' আলগোছে কথাগুলো শেষ করেই চমকে ওঠে শীর্ষ। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। চোখদুটো ছোরার মত জ্বলছে, ''কি ভাবো আমাদের ? বাজারের মেয়েছেলে বলে ভালো লাগা-টাগা গুলো সব চুকিয়ে ফেলেছি নাকি ? কি ভাবো তুমি ? শালা শখ করে রোজ পুরুষের কামড় খেতে এসেছি ? আমাদেরও শখ আহ্লাদ ছিল, বুঝলে। খালি তোমাদের ঘরের মেয়েছেলে গুলোই মেয়েছেলে, আর আমরা সব যন্ত্র, না। তাহলে এসেছে কেন, যাও না বাড়ি গিয়ে নিজের বউ-এর ম্যাক্সি খুলে শুয়ে পড়। আমার ঘরে মারাতে এসেছ কেন ? যাও, যাও'' বিউটি হিসহিসিয়ে ওঠে। শীর্ষ থম মেরে যায়। কথা হাতড়াতে থাকে।

— ''আরে, রাগ করছো কেন এত ? তোমাদের ওসব বলতে হয় বলেই বললাম। বসো, বসো আমি তোমায় দুঃখ দিতে চাইনি।'' শীর্ষর গলাটা অচেনা হয়ে এল, ''আমি আর কাউকেই দুঃখ দিতে চাইনা।''

শীর্ষ আস্তে-আস্তে উঠে গেল বিউটির কাছে। উত্তেজনায় ফুঁসতে থাকা বিউটির বুকদুটো খুব জোরে জোরে ওঠানামা করছে, কালচে ঠোঁট দুটো ফুলে গেছে। যত রংচটাই হোক, মেয়েটাকে দেখতে ভালো লাগছে এখন। এ'পাড়ার বাইরের মেয়েদের মত লাগছে। রুমকিটা রেগে গেলে এমন করত। দুর শালা কোথায় রুমকি আর কোথায় এই বাজারী মেয়েটা। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে শীর্ষর। মনটাকে ঘোরাতে গিয়েও চোখ ফেরাতে পারল না শীর্ষ। বিউটির দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালোই লাগছে ওর। মেয়েটাও এখন চুপ করে গেছে শীর্ষ এভাবে উঠে আসায়। অবাক হয়ে দেখছে শীর্ষর দৃষ্টির বদল। বাঁ হাতটা তুলে শীর্ষ আলতো করে ধরল বিউটির ডানদিকের বুকটা। বিউটি কাছে এগিয়ে এল কিছুটা। শীর্ষ ডান হাত দিয়ে বিউটির পিঠটা জড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট বসাতেই মেয়েটা দু'হাতে আঁকড়ে নিজের ভিতর টেনে নিল শীর্ষকে। শীর্ষ নিজেকে আর ধরে রাখবার কথা ভাবতে চাইল না। পাগলের মতো আদর করতে করতে বিউটিকে টেনে আছড়ালো বিছানায়, বুকে মুখ গুঁজে দিতে দিতে হঠাৎ মাথা তুলল, ''কি রে, এখন আর তোর শরীর খারাপ লাগছে না ?''

— ''না, শরীরটা এখন ভীষণ ভালো লাগছে'' বলতে বলতে শীর্ষকে বিছানায় পেড়ে ফেলে বুকের উপর উঠে গায়ের টি শার্টটা একটানে খুলে দিল বিউটি।

# # #

মা কি সত্যিই মারা যাবে ? আর বাঁচবে না ? কেন ? এই যে এত এত ঔষধ খাচ্ছে, বাপি রোজ বলছে 'কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি', তাতেও সারবেনা মা ? বাপি কি মিথ্যা বলছে ? মিছিমিছি ঔষধগুলো খাওয়ানো হচ্ছে মা'কে ? মা'টাও কেমন বদলে গেছে। আর একটুও চেঁচামেচি করেনা। আগে পড়া, পোষাক কত কিছুই নিয়ে টিকটিক করত, এখন খুব মিষ্টি করে হাসে, আদর করে কথা বলে, কাছে ডেকে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে চুপচাপ। মা'ও বোধহয় বোঝে যে আর বাঁচবেনা। কিন্তু কেন ? কেন এ'রকম ? সব্বার মা থাকবে, এমন কি মা'র মা'ও শুধু আমার মা'ই কেন চলে যাবে ? মা'কে ছাড়া আমি থাকবো কেমন করে ? আমার যে খুব কষ্ট হবে — এই অবধি লিখে পাপান টের পেল ঝরঝর করে জল নেমে আসছে দু'চোখের ভিতর থেকে। এখন রোজ ডায়েরী লেখে পাপান। দেখেছে, লিখলে মনটা একটু হলেও হালকা হয়। কি যে হয়ে গেল হঠাৎ। হজম করতে বড় অসুবিধা হয় পাপানের। মা যে দিন-দিন কাহিল হয়ে পড়ছে, স্পষ্টই বোঝা

যাচ্ছে। এরমধ্যে তো একদিন শরীরটা খুব খারাপ করেছিল। সেদিন আবার বাপি মুম্বাইতে, কিসব জরুরী মিটিং ছিল, না হলে মা'র অসুখের পর থেকে বাপি অফিসের কাজে বাইরে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছে। সেদিন পাপান সবে স্কুল থেকে ফিরেছে আর দেখে মা'র শরীর খুব খারাপ। প্রচন্ড ঘামছে, বিছানায় বসে শ্বাস হাতড়াচ্ছে। দিদাকে ফোন করতে ইচ্ছা করেনি তার, বুড়ি মানুষ, ঘাবড়ে যাবে। কি মনে হয়েছিল, প্রথম ফোনটা ইমনকে করেছিল পাপান। কেমন যেন মনে হয়েছিল, ইমনটা এই সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালে বেশ হয়। ইমন আসেনি, ও জয়েন্টের কোচিং-এ ছিল। ছেড়ে আসা মুশকিল বলেছিল। ভীষণ অভিমান হয়েছিল পাপানের ভীষণ দুঃখ, তবু, নিজেকে সামলে দ্রুত শিঞ্জিনিমাসিকে ফোন করেছিল। শিঞ্জিনিমাসিকে মাসি বলতেই ইচ্ছা করে তার, পিসি নয়। শিঞ্জিনিমাসি তো বাবার বোন নয়, বন্ধু, বরং মা'ই দিদি বলে। শিঞ্জিনিমাসি দৌড়ে চলে এসেছিল। ততক্ষণে ডাক্তারকাকু এসে পড়েছে। মা'কে ভালো করে দেখে, ইসিজি করে বলেছিল ছোট একটা হার্ট অ্যাটাক মত হয়েছে। শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল পাপান। শিঞ্জিনিমাসি বাড়ি যায়নি সেদিন। বাবা, দিদা আর নিজের বাড়ি ফোন করে সারারাত থেকে গিয়েছিল পাপানের কাছে। বসেছিল মা'র মাথার কাছে। পাপান ভরসা পেয়েছিল। পাপানের খুব ইচ্ছা করছে ইমনকে একটা ফোন করতে। কি করছে এখন ইমন ? মনে হয় সকালের পড়াশুনা নিয়ে বসেছে। ফোনটা করবে এখন ? ইমনটা আবার বড্ড বেশী সিরিয়াস। পড়তে বসে থাকলে কথাই বলতে চাইবে না। নিজের পড়াশুনা আর কাজগুলোকে খুব ভালোবাসে ইমন। সেসব করবার সময়ে কাউকেই চেনেনা ইমন, পাপানকেও নয়। মাঝে-মাঝে অভিমান হয় পাপানের। মনে হয় ইমন বুঝি ওকে স্টপগ্যাপ টাইমে ভালোবাসে। আসলে ইমন একটা অদ্ভুত ছেলে। একই সঙ্গে কেরিয়ারিস্ট আর রোম্যান্টিক। পাপানের ওই রোমান্টিক অংশটাই ভালো লাগে, ওখানটাতেই একটা অদম্য আকর্ষণ অনুভব করে ও ইমনের প্রতি। আচ্ছা, ইমনের মধ্যেকার যে রোমান্টিসজম্ তা ওর চেহারা আর কথা বলবার ভঙ্গিতে যতটা, আচরণেও কি ততটা ? দুর, এই সাত সকালে অতকিছু ভাবতে ভালো লাগছেনা। ইমনকে তার খুব ভালো লাগে, ইমনকে সে ভালোবাসে, ব্যস, এই তো যথেষ্ঠ, অত কচকচির মধ্যে ঢুকে কি হবে ? আচ্ছা, ধরা যাক, ইমন তাকে তেমন ভালোবাসেনা, তাতেই বা কি হল ? পাপানের ভালোবাসা কমে যাবে ? ভালোবাসা আর ভালোলাগা কি একটা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার না কি ? এ'সব তো মনের ভিতর থেকে উঠে আসে। ইমনের গভীর চোখের মুখটা আরও একবার ভেসে উঠল পাপানের মনের ভেতর। মোবাইলটা হাতে নিয়ে ইমনের নম্বরটা টিপতে যেতেই মোবাইলটা বেজে উঠল। ইমন !

— ''হ্যালো, ইমন, আমি এইমাত্র মোবাইলটা হাতে নিয়ে তোমাকে কল করতে যাচ্ছিলাম, বিশ্বাস করো, আর তোমারটা এসে গেল।'', পাপান ফোনটা রিসিভ করেই মজাটা ভাগ করতে চাইল।

— ''তাই ?'' ইমনের গলাটায় কি একটু টেনশন, ''কি করছ ?'' ''আজ তোমার ক্লাস আছে ?''

— ''না, না এখন তো ভেকেশন চলছে'', পাপান তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। ইমন কি কিছু বলবে, পাপান অপেক্ষা করতে থাকে।

— ''বলছিলাম, আজ সকাল এগারোটায় একবার ম্যানেজ করে নিউমার্কেট বারিস্তায় আসতে পারবে ? কথা ছিল।'' ইমন প্রস্তাব দেয়।

পাপানের মনে হয় আজকের দিনটা বড় সুন্দর একদম অন্যরকম। ইমনটা যেচে দেখা করতে চায় না। ওই স্কুলের সামনের পার্কটা অবধিই, ব্যস, অন্য কোনও পাবলিক প্লেসে দেখা করায় নাকি রিস্ক আছে। কেউ দেখে ফেলতে পারে, কেউ কিছু ভেবে ফেলতে পারে। আজ পর্যন্ত যতবার তারা কোন ও কফিশপ বা শপিং মলে দেখা করেছে প্রত্যেকবারই পাপানই জোর করেছে। আজ ইমন দেখা করতে চাইছে দেখে পাপানের ভীষণ ভালো লাগল।

— ''হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমি এগারোটায় চলে আসব'' উত্তরটা দিতে পাপান একটুও সময় নিতে চাইলনা।

— ''ওকে, সি ইউ দেন। টা টা '', ইমন ফোন রেখে দেয়।

পাপান একলাফে বিছানায় গিয়ে পড়ে, প্রথমে চিৎ হয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে, তারপর কোলবালিশটা বুকে চেপে উপুড় হয়ে নিজের মনেই ভীষণ নীরব একটা হাসি হাসে কিছুক্ষণ , তারপর বালিশটাকে খুব জোর চেপে ধরে একটা আদর করে জানালার রোদটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় । নিচে দিয়ে মানুষজন গাড়ি-ঘোড়ার যাতায়াত শুরু হয়েছে । তাদের দিকে পরম স্নেহে তাকিয়ে পাপান মনে মনে বলতে থাকে, ''ইমন কলিং, ইমন কলিং, ইমন ।'' জানালার গ্রীলের মাথাটায় একটা কাক বসে কর্কশ গলায় কা' করতেই পাপান কাকটাকে ''অ্যা....'' বলে মুখ ভেঙচে টয়লেটে ঢুকে পড়ে ।

— ''মাসিমা কেমন আছে এখন ?'' ইমন প্রসঙ্গ পাল্টে হঠাৎ প্রশ্নটা করল । এতক্ষণ আবেগের পাল তোলা নৌকায় তরতর করে ভেসে যাচ্ছিল পাপান । আজ কফিশপটায় পৌঁছোতেই ভারী ভালো লেগে গিয়েছিল তার । এর আগে যতবারই তারা দেখা করেছে কোথাও, প্রত্যেকবারই সে আগে পৌঁছেছে, ইমন অন্ততঃ পনের-কুড়ি মিনিট পরে । প্রথম প্রথম খারাপ লাগলেও এটাকেই নিয়ম বলে ধরে নিয়েছিল পাপান । আজ সে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল । ইমন আগে থেকেই পৌঁছে অপেক্ষা করছিল । ইমনকে দেখলেই মনের ভিতরটা কেমন যেন পাক দিয়ে ওঠে । পাপানের খুব ইচ্ছা হচ্ছিল ইমনের হাতদুটো একটু ধরে । কিন্তু ইমন এ'ভাবে রাজী হবে না আন্দাজ করে পাপান একগাদা বকবক শুরু করে দিয়েছিল । তার পড়ার কথা, আসন্ন শীতকালের কথা, নিজের ভাবনা-চিন্তাগুলোর কথা, ইমন হুঁ হাঁ করে শুনে যাচ্ছিল, হঠাৎ আচমকা প্রশ্নে পাপান বিব্রত হয়ে গেল ।

''আরে কি হল ? মাসিমার শরীর কেমন এখন ?'', ইমন আবার প্রশ্নটা করল

— ''ভালো নয় । তোমাকে তো বলেই ছি সব । সবাই জানে, এমনকি মাও, কি হবে, তবু লড়াই তো একটা চালাতেই হয়,'' পাপানের মনটা ভারী হয়ে আসে ।

''হ্যাঁ, লড়াই তো চালাতেই হয়'', ইমন পিঠটান করে বসে, ''কিন্তু লড়াই করবার তো একটা নিয়ম আছে, লড়াই টাকে স্তরে স্তরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে কি ?''

— ''মানে ?''

— ''মানে আমি বলতে চাইছি,'' ইমন বোঝানোর ভঙ্গি করে, ''মাসিমাকে তোমরা কলকাতায় দেখাচ্ছো, কিন্তু টাটা মেমোরিয়াল বা অন্য কোথাও নিয়ে গেলেনা কেন ? মেসোমশাই এর আর যাই হোক টাকা বা কানেকশনের অভাব নেই । পাপান, ডোন্ট ইউ থিংক ইওর ফাদার শুড বি আ লিটিল বিট মোর সিরিয়াস অ্যাবাউট দিস ?''

পাপান আহত হয়, ''এভাবে বলছ কেন ইমন ? বাপি ইস্ ডুয়িং অ্যা লট ফর মা । আর দেখো, তুমি যেটা বলছ, সেটা নিয়ে আমরাও কথা বলেছি । কিন্তু মা'র যে স্টেজ, তাতে কোথাও নিয়ে যাওয়া না নিয়ে যাওয়া সমান'' ।

— ''নিজেরাই সেটা বুঝে গেলে ?'' ইমনের গলায় স্পষ্ট শ্লেষ । পাপান অবাক হয় । ইমন এ'ভাবে বলছে কেন ? তবু মাথা ঠান্ডা রেখে পাপান জবাব দেয়, ''না, তা কেন ? আমরা ডাক্তারবাবুর সঙ্গেও আলোচনা করেছি । ওনারও এই একই মত '' ।

— ''ন্যাচারালি'' ইমন কাঁধ ঝাঁকায়'', নিজের হাত থেকে রুগী ছেড়ে দিতে কোন ডাক্তারের ভালো লাগে পাপান ? আফটার অল, একটা রুগী ধরে রাখতে পারা মানে, আরও পয়সা । এনিহাউ, আমার সাজেশন দেওয়ার ছিল, দিলাম । ইনফ্যাক্ট, কাল ডিনার টেবিলে তোমার পরিচয় না দিয়েই ড্যাড এর সঙ্গে ইস্যুটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম । তো ড্যাড ও বলল একবার ভালো কোথাও নিয়ে গিয়ে চেষ্টা না করাটা বোকামো, তাই ভাবলাম তোমাকে কনভে করি '', ইমন দম নিল কিছুটা, তারপর হঠাৎ খুব দ্রুত লয়ে পরের শব্দগুলো উচ্চারণ করল, ''আসলে, বুদ্ধি দেওয়ার সোর্সে গন্ডগোল থাকলে বড় মুশকিল''।

শেষের কথাগুলোর মানে ধরতে না পেরে পাপান চুপ করে রইল। একটুখানি চুপ করে থেকে ইমন হঠাৎ ছুঁড়লো প্রশ্নটা, ''আচ্ছা পাপান, তোমার ওই শিঞ্জিনিমাসি লোকটা কেমন ?'' আজ পরতে পরতে ইমনকে অচেনা লাগছে পাপানের। এ আবার কেমন প্রশ্ন ? তবু উত্তরটা দিল পাপান, ''ভালো, খুবই ভালো তুমি তো জানো ইমন, শিঞ্জিনিমাসি বাপির খুব ভালো বন্ধু ''।

— ''খুব ভালো বন্ধু'', পাপানের কথাগুলো নেড়ে চেড়ে স্বগতোক্তির ধরণে প্রশ্নটা ভাসায় ইমন, ''হুঁ, কিন্তু কতটা ভালো বন্ধু, কেমন ভালো বন্ধু, ভেবে দেখেছো পাপান ? আসলে আমি যেটা বলতে চাইছি, তা হল ওনাদের রিলেশনটা ঠিক কি ?''

— ''কিন্তু তুমি এসব জানতে চাইছ কেন ?'' পাপান অবাক হয়। ''কারণ আছে, পাপান, কারণ আছে। তোমার মা-র অসুখের সঙ্গে ওনাদের সম্পর্কের একটা মারাত্মক কারণ আছে। দ্যাখো স্পষ্টই বলছি, ওনাদের রিলেশনটা আমার যথেষ্ট ডাইসি লাগে। কোথাও একটা কিছু আছে নিছক বন্ধুত্বের বাইরে অ্যান্ড ইফ্ দ্যাট ইস সো, তাহলে ওনাদের নিজেদের সুবিধার জন্য ওনাদের পক্ষ্যে তোমার মা'র চিকিৎসায় অবহেলা করাটা খুব অস্বাভাবিক কি পাপন ? আর যেখানে ওই ভদ্রমহিলাই এই মুহূর্তে তোমাদের ফ্যামিলির ফ্রেন্ড, ফিলোজাফার অ্যান্ড গাইড।''

— ''ইমন'' অস্বাভাবিক ভাবে চেঁচিয়ে উঠেই নিজেকে সামলে নেয় পাপান। কফিশপটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা অন্য ছেলে-মেয়েগুলো এখন একঝলক তাকাচ্ছে তাদের দিকে। তবে ওই একঝলকই। এখানে সময় কাটাতে আসা সব ছেলে মেয়েই জানে, এমনসব কফিশপে বসে ঝগড়া করাটা খুব স্বাভাবিক তাদের পক্ষে — সবাইও কখনও না কখনও কম-বেশী এমন ঝগড়া ঝাটি কান্না-কাটি করে থাকে। পাপান গলাটা নামিয়ে আনে ''প্লিজ, এ'ভাবে বলো না ইমন, প্লিজ''।

— ''পাপান'', ইমন পাপানের হাতের উপর হাত রাখে,'' ''আমি তোমায় ভালোবাসি, তোমাকে আমার মনের কথাগুলো সৎভাবে বলাটা আমার কর্তব্য, তাই বললাম। ভেবে দেখো আমার কথাগুলো আরও একবার।'' ইমন উঠে পড়ে।

ইমন চলে গেলেও চেয়ারটা আঁকড়ে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে পাপান। ইমন অদ্ভুত একটা দিকে ইঙ্গিত করে গেল। না, ইমনের ইঙ্গিতের লক্ষ্যস্থল নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবতে চায়না পাপান। বাপি আর শিঞ্জিনিমাসির সম্পর্ক টা খুব পরিষ্কার ওর কাছে। পাপান এ'টুকু ঠিকই বোঝে যে ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে, সত্যিকারের ভালোবাসে। আর ভালোবাসে বলেই দুজনে দুজনের ভালো চায়, নয়তো শিঞ্জিনিমাসি তাকে আর মা কে এইসময়ে এ'ভাবে আগলে রাখতনা। শিঞ্জিনিমাসি অন্যরকম মনের মানুষ, যেমন মানুষেরা মানুষকে ভালোবাসতে ভালোবাসে, ঠিক তেমন। আর বাপি ও মাকে প্রাণপণ ভালোবাসে। না ইমন, তুমি যা বলে গেলে ঠিক নয়। তুমি ভুল বুঝছ, সংকীর্ণ চিন্তা করছ। এ'ভাবে ছোট চিন্তা করো না ইমন, তোমাকে ছোট ভাবতে খুব কষ্ট হয় আমার, খুব। পাপানের দুচোখ জলে ভরে এল।

# # #

গাঢ় কমলা জলরাশি ছুটে এসে পা ভিজিয়ে দিতে ভালো লাগল সন্ন্যাসীর। সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে গ্রামের বুকে। সারাদিনের অন্তহীন পরিশ্রমের পর গঙ্গার ওপারের মেদিনীপুরের দিকে অস্ত যাচ্ছে দিবাকর। যেতে যেতেও চিরদিনের সঙ্গী নদীটির বুকে রেখে যাচ্ছে প্রিয় চিহ্ন। আচ্ছা দিবাকর কি মায়ামুক্ত নয় ? তাকেও চলে যাওয়ার আগে এত ব্যাকুলভাবে নিজের চিহ্ন রেখে যেতে হয় ? নাকি যে কোনও বড় কাজের ধর্মই এই, স্রষ্টা চলে গেলেও সৃষ্টির রেশ রয়ে যায় ? পিছনে ঘুরে সন্ন্যাসী নিজের আশ্রমের দৃষ্টি দিলেন। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বাঁধানো মন্দির আর টিনের চালের দুটি ঘর নিয়ে পুকুরের ধারে জেগে আছে আশ্রমটি। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে ঢেকে দিতে শুরু করেছে শ্বেতশুভ্র মন্দিরটিকে। নদীতীরে আসবার সময় একটি হালকা আলো জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছিলেন টিনের চালের ঘরগুলোর একটিতে। বাইরের আলো স্তিমিত হয়ে আসাতে এখন সেই আলোটি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এভাবেই বাইরের টান, বাহ্যিক আড়ম্বর স্তব্ধ হয়ে এলে জাগ্রত আর স্পষ্ট হয়ে ওঠে

অন্তরের জ্ঞানালোক, ভাবলেন সন্ন্যাসী। এই সময়টায় গঙ্গার ধারে একাকী দাঁড়িয়ে থেকে বিবিধ ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালো লাগে তাঁর। সন্ন্যাসী আবার বয়ে চলা জলকণা গুলির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন।

খুব সম্প্রতি মনের কোণে মৃত্যুচিন্তা উঁকি মারছে তাঁরও বিশেষতঃ দিনের এই সময়টায় বেশী করে নিজের মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করেন তিনি। তিনি সন্ন্যাসী, মৃত্যু বিষয়ে তিনি নির্ভীক, কিন্তু অসমাপ্ত কর্ম রেখে চলে যেতেও চান না তিনি। যবে থেকে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছেন, তবে থেকেই তিনি জানেন, জীবনের একমাত্র ধ্রুবসত্য হল মৃত্যু। আর যা কিছু সত্য বলে মনে হয়, তা আপেক্ষিক, তাকে সত্য বলে ভাবা মনের ভ্রম। একটি নির্দিষ্ট জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যা যা ঘটে চলে, তার কোনও কিছুই চিরন্তন নয়, এমন কি মানুষের মূল্যবোধও নয়। যুগে যুগে মূল্যবোধও পরিবর্তিত পরিমার্জিত হয়। শুধু কিছু শাশ্বত অনুভব আছে, তা চিরস্থায়ী। সততা, ভালোবাসা, সেবা এইসব অনুভব মানুষের জীবনে চিরকালীন, তবে তা অন্তিম ও চরম সত্য নয়। বরং বলা যেতে পারে জন্মের ঘর থেকে মৃত্যুর প্রাসাদে পৌঁছানোর পথে জাগতিকতায় অন্ধ মানুষের এ'গুলো ষষ্ঠী। যে মানুষ এই ষষ্ঠীকে যত দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে থাকতে পারবে, তার যাত্রাপথ ততই সুগম হবে। সন্ন্যাসী তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনায় এ' অনুভব লাভ করেছেন, কাজেই ষাটের কাছাকাছি বয়স গড়িয়ে এলেও মৃত্যুভয় তাঁকে স্পর্শ করে না, বরং কবে সেই মহাক্ষণটিকে বুকে আলিঙ্গণ করবেন, সে অপেক্ষাতেই তিনি আছেন। তাঁর চিন্তা কিছু ভিন্ন।

কিছুদিন যাবৎ আশ্রমের পাশের জমিতে যে বৃদ্ধাশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনায় তিনি হাত দিয়েছেন, তার কাজ এখনও বহু বাকি। খালি সদিচ্ছা দিয়ে যদি কোনও মহৎ কার্য সম্পাদনা করা যেত, তবে কবেই এ' আশ্রম প্রস্তুত করে ফেলতে পারতেন সন্ন্যাসী। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়, হাজার গন্ডা প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা আর আর্থিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তবেই একটু একটু করে এগোনো যায়। তাঁর সন্ন্যাসী পরিচয়ের জন্য হয়তো কিছুটা অব্যহতি তিনি পান এ'সব সঙ্কট থেকে, তবু বাধা প্রচুর, এ'দেশে নানা কাজে গতি এখনও বড় শ্লথ, সে অত্যন্ত শুভ কাজ হলেও। কিন্তু তাও তার চিন্তার বিষয় নয় তিনি সন্ন্যাসী, এত সহজে বিচলিত কিংবা হতোদ্যম হতে তিনি জানেন না। কিন্তু তাঁর চিন্তা, জাগতিক বয়সের বিচারে তিনি মৃত্যুর বাড়ির চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছেন। দীর্ঘদিনের সংযমী জীবনযাত্রা তাঁকে এ'যাবৎ সুগঠিত ও নীরোগ স্বাস্থ্য দিয়ে রেখেছে বটে, কিন্তু জীবনের অমোঘ সত্যের আড়ালের সামনে তো তা তুচ্ছ।

সন্ন্যাসীর সমস্যা হল, এখনও অবধি তাঁর পরে হাল ধরবার কাউকে তিনি খুঁজে পেলেননা। অতীতে দু-তিনজনকে তিনি ব্রহ্মচারী হিসাবে তাঁর আশ্রমে আশ্রয় দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাদের বিদায় করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, ওই মানুষগুলির অন্তরে সে আগুন নেই, যে আগুনে শুধু নিজের নয়, আরও দশজনের মঙ্গল সাধন করা যায়। কর্মে তাঁর প্রবল বিশ্বাস, নিজেকে নিছক সন্ন্যাসীর থেকে কর্মযোগী ভাবতেই বেশী ভালোবাসেন তিনি। শুভ কর্মের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের চরণ যেভাবে স্পর্শ করতে পারেন তিনি, হাজার সাধন ভজনেও তা সম্ভব হয়না। সন্ন্যাসী কেন শুধু নিজের মুক্তির কথা ভাববে ? সে তো মুক্ত হবেই, কিন্তু তার কাজ তো অতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। সেই প্রাপ্ত মুক্তির আলো যদি অন্য আবদ্ধ মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে না দেওয়া গেল, তবে সন্ন্যাসের সার্থকতা কোথায় ? ঠিক এইখানটাতেই আটকে গেছেন সন্ন্যাসী, যে জীবনদর্শন তিনি আরদ্ধ করেছেন, তার যোগ্য উত্তরসূরী খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। শুধু একটি মানুষের মধ্যে সে জীবনদর্শনের হালকা বিচ্ছুরণ দেখেছেন সন্ন্যাসী, সে নীল। হ্যাঁ নীল। নীলকে বহু বছর ধরে দেখছেন তিনি, সেই প্রথম প্রথম নীল যখন আসত, তখন থেকেই ছেলেটিকে দেখে তাঁর মনে হত, এ'ছেলে ক্ষুদ্র সংসারের জন্য নয়। কতবার ইচ্ছা করেছে নীলকে নিজের কাজে ডেকে নেবেন, কিন্তু অকালে পিতৃহারা ছেলেটির সাংসারিক দায়বদ্ধতার কথা চিন্তা করে পিছিয়ে এসেছেন। আজ নীল সুপ্রতিষ্ঠিত, জাগতিক জীবনে নীলের স্থান ভরপুর, তবু নীলের মধ্যে একটি আসল মানুষকে দেখতে পান সন্ন্যাসী। তিনি বোঝেন, দৈনন্দিন পার্থিব জগতে নিমজ্জিত হতে হতেও নীলের মধ্যে সেই আসল মানুষটা বেঁচে রয়েছে প্রবলভাবে। সৎ কাজ, সৎ চিন্তা, সৎ আলোচনা করবার সময় নীলের মুখে যে দীপ্তির আভাস তাঁর চোখে ধরা পড়ে, সে দীপ্তি সন্ন্যাসীকে বারবার বলে দেয় এ' ছেলেটি এতটুকুর জন্য নয়, এ'ছেলের জন্য বৃহত্তর মঞ্চ অপেক্ষা করে রয়েছে।

কিন্তু নীল কি আদৌ আসতে পারবে কোনওদিন ? সন্ন্যাসী প্রতিবারের মতো আজও সন্দিহান হয়ে উঠলেন।

জাগতিকতা আর নানাবিধ পার্থিব চাহিদা শক্ত করে চেপে ধরে আছে নীলের দু'পা। সে কি পারবে সেসব বাধা অতিক্রম করে একদিন বৃহৎ এর মাঝে মহৎ এর ডাকে সাড়া দিয়ে দাঁড়াতে ? কে জানে। সন্ন্যাসী এর উত্তর খুঁজে পাননা। অথচ নীল বড় উপযুক্ত পুরুষ, ওকে পাশে পেলে বড় ভালো হত। সন্ন্যাসীর মন ঈষৎ বিষণ্ন হয়ে উঠল। তিনি গঙ্গার ধার ছেড়ে পা বাড়ালেন আশ্রমের দিকে। ফিরে যেতে যেতে পুকুরটির সামনে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। এ' পুকুর তিনিই কাটিয়েছিলেন একদা। পুকুরটিতে কিছু ময়লা জমেছে। গ্রামের কোনও যুবাকে অনুরোধ করে সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। আবদ্ধ হয়ে থাকবার এই সীমাবদ্ধতা। নিজেকে পরিশ্রুত ও পরিশুদ্ধ করবার জন্য অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়, অথচ দ্যাখো, এই পুকুরটির কত কাছ দিয়েই তো বয়ে চলেছে গঙ্গা। তার নিজস্ব গতি আছে, তাই এ'সব আবর্জনা তার চলা বা সৌন্দর্যকে প্রতিহত করতে পারে না। পাশাপাশি দুটি জলের উৎস, অথচ তাদের চরিত্র এবং জীবনযাত্রায় কত প্রভেদ ! একমাত্র যখন নদীতে বান আসে বর্ষাকালে, তখন জল কূল উপচিয়ে আশ্রম প্রাঙ্গনের ভিতর দিয়ে এসে মিশে যায় পুকুরের বুকে। সেই মুহূর্তে ওই নদী আর এই পুকুর মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। খন্ড আশ্রয়ে আবদ্ধ থাকা পুকুরটি পায় বৃহৎএর স্বাদ, সেও সেদিন বড় কিছুর অংশীদার হয়ে উঠতে পারে অনায়াসে। চিন্তাটি মাথায় আসা মাত্র মাথায় বিদ্যুৎ ঝলকের মত ভাবনা খেলে গেল সন্ন্যাসীর। আচ্ছা, তিনি তো ওই বর্ষার বানের ভূমিকাটি পালন করতে পারেন নীলের জীবনে। বৃহৎ চিন্তাকে বারবার বানের জলের তোড়ের মতো এনে ফেলতে পারেন নীলের আপাতঃ আবদ্ধ মনের প্রাঙ্গনে। নীলকে বারবার মিশিয়ে দিতে পারেন বৃহৎ-এর সঙ্গে, নীলকে অনায়াসেই সুযোগ করে দিতে পারেন বৃহত্তর জীবনদর্শনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়ার। কে বলতে পারে, নিরন্তন আড়ালে একদিন আবদ্ধ পুকুর অনায়াস সলিকা নদী হয়ে উঠবেনা ? সন্ন্যাসীর মনটা ভালো লাগায় ভরে গেল। যেন বহু বছরের অন্বেষণ শেষে অন্ধকার গুহার দ্বারে আলোর সন্ধান পেয়েছেন তিনি। একটু আগে যে বিষণ্নতা তাঁকে গ্রাস করে ফেলছিল, তা নিমেষে উধাও হয়ে গিয়ে এখন প্রশান্তির একটা ভাব বিরাজ করছে তাঁর মনে। মনে-মনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে স্মিত মুখে মন্দির অভিমুখে হাঁটতে শুরু করলেন সন্ন্যাসী।

# # #

''নীল, মানুষ এ' সংসারে বাঁচে তার প্রিয়জনদের আঁকড়ে। তবু কখনও কখনও সেই প্রিয়জনদের দূরে চলে যাওয়াও হাসিমুখে মেনে নিতে হয়। আসলে, মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব মুহূর্তরা এমন সব মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসে দাঁড়ায় যে তখন প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ সে উদ্দেশ্যের সামনে তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে ওঠে'', শিঞ্জিনি একটু থামল, যেন সময় নিচ্ছে তার বলা কথাগুলো নীল যাতে হৃদয়াঙ্গম করতে পারে তারজন্য, ''বুঝলে নীল, আজ তুমি আমি যে বয়সে এসে দাঁড়িয়েই এবং যে মানসিক গঠন নিয়ে, তাতে এমন সব ঘটনা অনিবার্য''।

— ''আমি বুঝি শ্রী'', মোবাইলের ওপ্রান্ত থেকে নীলের শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, ''জয়িতার আসন্ন চলে যাওয়ার জন্য আমি নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছি। এ'কথা ঠিক যে যেমন করেই হোক, জয়িতা আমার জীবনে অনেকখানি, ও চলে গেলে ভীষণ কষ্ট হবে আমার, আবার এ'কথাও ঠিক যা ঘটবেই তার জন্য আমি তৈরী। বুঝলে শ্রী, পাপানটাও দ্রুত বড় হয়ে গেল এ' ঘটনায়। কত ধীর-স্থির, কত দায়িত্বশীলা হয়ে উঠেছে মেয়েটা। সেই প্রথম শোনার দিনের পর থেকে মেয়েটাকে একফোঁটা কাঁদতে দেখলাম না আমি, বরং জয়িতাকে আগলে রাখে। কিন্তু তুমি যা বলছ, তা যদি মেনেই নিই, জয়িতার চলে যাওয়ায় আবার জীবনে কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে শ্রী ?''

— ''জানিনা নীল ঠিক বলতে পারবোনা। কিন্তু জানো, চিরকালই আমার মধ্যে একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সময় বিশেষে জেগে উঠে কাজ করতে থাকে। আসন্ন ঝড় বা ভূমিকম্পের আগে যেমন জানোয়ারেরা তা টের পেয়ে যায়। ঠিক তেমনই মাঝে-মাঝে বড় কোনও ঘটনা ঘটনার আগে আমি সেই ঘটনার পরবর্তী প্রভাবগুলো টের পেতে থাকি। হয়তো আগাম

অবশ্যম্ভাবী ঘটনাগুলোকে মনে-মনে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করি বলেই । আমার মন বলছে নীল, খুব শীঘ্র তুমি আমি একা হয়ে যাবো আবার আমার মন এও বলছে যে খুব শীঘ্রই তুমি আমি এক হয়ে যাবো । একটা বড় কারণ সব সমীকরণ ওলট-পালট করে দিতে চলেছে নীল,'' শিঞ্জিনির শেষের কথাগুলো যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসে ।

নীল অবাক হয় । তার একাকীত্ব দিনের আলোর মত স্পষ্ট, সে তার জন্য প্রস্তুতও । কিন্তু শ্রী তার জীবনে কোন একাকীত্বের কথা বলছে ? তার পরিবারে তো সেভাবে কোনও বিপদ নেই । প্রশ্নটা তুলতেই হেসে ফেলে শিঞ্জিনি, তারপরেই ভীষণ অচেনা একটা মানুষের গলায় বলে যেতে থাকে, ''আছে নীল আছে । ঔই যে, তোমায় বললাম, আমি গন্ধ পাই । নীল, কিছু নাটক ঘটে মঞ্চেও, আর নাটকের মধ্যেকার যে নাটক, অথবা নাটকের পিদিমের সলতে পাকানোর যে নাটক, তা ঘটে চলে উইংসের আড়ালে । অভিজ্ঞ শিল্পীর তা টের পেতে অসুবিধা হয়না । আমি জানি, আমার কথাগুলো বুঝতে তোমার অসুবিধা হচ্ছে, খুব সম্ভবতঃ আমার ও বোঝাতে, কিন্তু বিশ্বাস করো, এর চেয়ে বেশী বোঝানোর চেষ্টা করবার উপায় এই মুহূর্তে আমার নেই । কিন্তু আমি জানি, আমার সংসারের আড়ালে-আবডালেও একটি বড় নাটকের পটভূমিকা লেখা হচ্ছে । আছড়াবে, সে নাটক, আমার ভুল না হলে, ঘূর্ণীঝড়ের মতো আছড়ে পড়বে আমার জীবনে । তারজন্য আমি প্রস্তুত''। এতটা বলেই সম্বিত ফেরবার ধরণে এক ঝটকায় প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে শিঞ্জিনি, ''যাক, ও'সব ছাড়ো নীল, অ্যাই, বলো তো তোমার উপন্যাসের কতদূর ?''

— ''উপন্যাস'' হঠাৎ প্রসঙ্গের পরিবর্তনে থতমত খেয়ে যায় নীল, বোঝে শিঞ্জিনি এ' প্রসঙ্গে এই মুহূর্তে আর কথা বলবেনা । শিঞ্জিনিকে সে চেনে, তাই পরিবর্তিত প্রসঙ্গেই মন ফেরানোর চেষ্টা করে, ''এগোচ্ছি কিছু কিছু করে । যখন লিখি, তখন মনে হয় আমার সমস্ত অনুভূতি উজাড় করা এক সৃষ্টি করে চলেই, আবার পরে যখন পড়তে বসি, মনে হয় কিচ্ছুটি হচ্ছে না ''।

— ''সৃষ্টির ধর্মই যে তাই নীল, প্রকৃত সৃষ্টি আর একনিষ্ঠ স্রষ্টার সম্পর্ক তো এমনই । ও নিয়ে তুমি ভেবোনা । অসন্তুষ্টিই তো শিল্পের আঁতুরঘর । সন্তুষ্ট হয়ে গেলে সৃষ্টি করবে কি করে ? তুমি খালি মন প্রাণ ঢেলে লিখে যাও । তোমার ও সৃষ্টি যে আমার স্বপ্ন নীল, আমার ভালোভাবে বেঁচে থাকবার মূল রসদ, ''শিঞ্জিনি একটু থামে, তারপর ভীষণ নরম গলায় উচ্চারণ করে, ''নীল, এখন রাখি, কেমন ? ভালো থেকো, আমি আছি তো !'' মোবাইলটা খাটের উপর ফেলে রেখে শিঞ্জিনি ধীরে ধীরে জানলার পাশে এসে দাঁড়ালো । আকাশটায় মেঘ করে আছে, একটা চাপা উদ্বেগ যেন ছড়িয়ে আছে সারা আকাশটার গায়ে । এমন সব মেঘেরা বড় অদ্ভুত হয়, তাদের বৃষ্টি ডেকে আনবার ক্ষমতা আছে কিনা তা শেষ মুহূর্ত অবধি বোঝা যায়না । অপেক্ষা করতে করতে যখন শেষ পর্যন্ত টিপটিপ-টুপটুপ শব্দ থেকে ঝিরিঝিরি হয়ে ঝমঝম শব্দ ঝরে পড়ে আকাশের বুক থেকে, একমাত্র তখনই বোঝা যায় ও মেঘের চোখে বৃষ্টির ঠিকানা লেখা ছিল । আসলে, জীবনে কিছু কিছু পরিস্থিতি আসে যেগুলোর আভাস হয়তো আগের থেকে হালকাভাবে হলেও থাকে, কিন্তু তা এতই হালকা যে তাকে প্রতীয়মান বলে ধরাও চলে না আর সম্ভাবনাহীন বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না । শিঞ্জিনির জীবন এখন সেইরকম এক মেঘের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে । সে মেঘ ঝড় ডেকেও আনতে পারে, আবার হালকা পেঁজা তুলোর মত ভেসে যেতে পারে সব আশংকাকে অনাবশ্যকতায় পরিণত করে ।

অনিন্দ্য একটা ঝোঁকের মাথায় কলকাতা শহরে চলে এসেছিল বটে কিন্তু খুব শীঘ্রই ওকে অস্বস্তিতে পড়ে যেতে হয়েছিল । অনিন্দ্য মুখ ফুটে তাকে কোনওদিন কিছু স্পষ্ট করে বলেনি বটে, কিন্তু শিঞ্জিনির বুদ্ধি আর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাকে খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে অনিন্দ্য নতুন আবহে, নতুন চাকরিতে স্বস্তিবোধ করছে না ।

অস্বস্তির একাধিক কারণ থাকতে পারে, যার প্রত্যেকটাই, শিঞ্জিনি বোঝে বাস্তবসম্মত । দীর্ঘদিন বিদেশে কাজ করে এসেছে অনিন্দ্য । সেখানে কাজ করবার ধরণ, পরিবেশ, এককথায় যাকে বলে ওয়ার্ক কালচার তা সম্পূর্ণ ভিন্ন । আমেরিকায় কেউ কারও কাজে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে না, পেশাদারীত্বই সেখানে শেষ কথা, গয়ংগচ্ছ মনোভাবের সেখানে কোনও স্থান নেই । অথচ ভারতে এখনও, বিশেষত কলকাতা শহরে, এ'সব অসুখ অত্যন্ত গভীরে তাদের শিকড় ছড়িয়ে রেখেছে ।

কাজেই একটা কালচারাল শক্ হওয়াটা অনিন্দ্যর মতো কেরিয়ার পাগল মানুষের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। অনিন্দ্যর কথা-বার্তায় প্রায়শই এসবের আভাস-ইঙ্গিত পায় শিঞ্জিনি। অনিন্দ্যকে শিঞ্জিনি খুব ভালো করে চেনে। দীর্ঘ অনেক বছর এক ছাদের তলায় অনিন্দ্যর সঙ্গে কাটিয়েছে সে। সে জানে, অনিন্দ্য ভিতরে ভিতরে ছটফট করছে এই পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর জন্য। বর্তমানে একটা বড়-সড় প্রজেক্টে জড়িয়ে আছে অনিন্দ্য। শিঞ্জিনি খুব ভালো করেই জানে, একবার এই প্রজেক্টটা থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে পারলেই অনিন্দ্য প্রথম সুযোগে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর চেষ্টা করবে এবং তার প্রথম লক্ষ্যই হবে আবার আমেরিকায় ফেরা। দেশ, নিজস্ব সংস্কৃতি-এসব কিছুই অনিন্দ্যর কাছে মুখ্য ছিলনা কোনওদিন হবেও না, অন্য কারও ইচ্ছে-অনিচ্ছেও নয়, অনিন্দ্যর একমাত্র মুখ্য প্রেম তার কেরিয়ার। কেরিয়ার তার অবশেসন। আগে চাকরি করে আসবার এবং এখনও যোগাযোগ রাখবার সুবাদে অনিন্দ্যর পক্ষ্যে সম্মানজনক একটা চাকরি জোটানো আদৌ কঠিন হবেনা, বোঝে শিঞ্জিনি। কিন্তু অসুবিধাটা অন্য জায়গায়। অনিন্দ্যকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই বিদেশে। কিন্তু শিঞ্জিনির পক্ষে কি সত্যিই আর সম্ভব কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়া ? শিঞ্জিনি আদৌ কি আর পারে কলকাতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে ? শিঞ্জিনিকে যে থাকতেই হবে কলকাতায়, থেকে যেতেই হবে আপাততঃ হয়তো অনির্দিষ্ট কালের জন্য, তাতে যে পরিস্থিতিই তৈরী হোক, যে ঝড়ই আছড়ে পড়ুক, শিঞ্জিনিকে বুক বেঁধে তার মোকাবিলা করতে হবে। জীবনে অন্তত একবার স্পষ্ট করে প্রমাণ করতে হবে নিজস্ব অস্তিত্ব।

টিপটিপ করতে করতে ঝুরঝুর বৃষ্টির শব্দে ভেঙে পড়ল মেঘগুলো। শিঞ্জিনি অবাক হয়ে চেয়ে বৃষ্টি ফোঁটাগুলোর দিকে, যেন জীবনে এই প্রথম বৃষ্টির মুখোমুখি সে। তারপর ডান হাত বাড়িয়ে হাতের তালুতে এক এক করে সংগ্রহ করে নিতে লাগল দামাল বেপরোয়া জলধারাগুলিকে।

# # #

ঘুমটা ভাঙতেই শীর্ষ টের পেল যে দুপুর থেকে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকা রোদ্দুরটা উধাও। যবে থেকে শীত-শীত ভাব এসে গেছে, সারাদিনের মধ্যে এই দুপুরের পর থেকে সময়টা হেভি মস্তির লাগে শীর্ষর। না না ভুল হয়ে গেল আবার, হেভি মস্তি নয়, ভীষণ ভালো, হ্যাঁ, এইভাবে ভাবতে হবে শীর্ষকে যে ভীষণ ভালো লাগে তার। শীর্ষর এখন আজে বাজে কথা বলা বারণ, মানে এতকাল শীর্ষ যেভাবে ভাবত আর বলত আর কি ! শীর্ষ এখন আর পাঁচটা ভদ্রলোকের মত ভাবা আর বলা অভ্যাস করছে। সাধুবাবা তো তাই-ই বলেছে করতে। সাধুবাবার সঙ্গে যোগাযোগটা দুম করেই হয়ে গেল। একটা রোববার সকালে শীর্ষ তখন সবে জলখাবারে হাত দিয়েছে, নীলদা এসে হাজির হয়েছিল। গাড়ি থেকেই ফোন লাগিয়েছিল ''অ্যাই শীর্ষ, নেমে আয় তো, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি তুই''। নীলদা লোকটা এইসময়ে তারজন্য এত করছে যে নীলদাকে না বলাটা শীর্ষর একটু মুশকিলই। আর তাছাড়া শীর্ষর কাজটাই বা কি আছে ? রুমকিটা মরে যাওয়ার পর থেকে পুরোনো কারবার-টারবার সব সে ছেড়েই দিয়েছে, নতুন কিছু করতেও আর ভালো লাগেনা। কাজের মধ্যে তো এক সন্ধ্যায় বিউটির কাছে যাওয়া। সারা রাস্তা নীলদা বললই না কোথায় যাচ্ছে, খালি আল সান, থুড়ি, মানে আজে বাজে গল্প করে কাটিয়ে দিল। ঘন্টা দেড়েক পরে যেখানটায় পৌঁছলো, সেটা ফলতার গঙ্গার ধারে একটা আশ্রম। শীর্ষ তো তাজ্জব। যা বাব্বা ! আশ্রমে আবার সে কি করবে ? আশ্রমটায় লোকজন বেশী নেই, খালি এক নেড়ামাথা লম্বা সাধুবাবা।

শীর্ষকে দেখেই একগাল হেসে বলেছিল, ''বোঝে শীর্ষেন্দু চা খাবে একটু ?'' ওরে বাবা ! সাধুবাবা তো তার নামও জানে, অবাক হয়ে গিয়েছিল শীর্ষ। কিন্তু যে কারণেই হোক জায়গাটা ফাটাফাটি, ইয়ে মানে, সুন্দর লেগেছিলো তার, একটু পরে সাধুবাবাকেও। এমনিতে শীর্ষর সাধু-টাধু বিশেষ পছন্দ নয়। মা-র একটা দাড়ি গোঁফ ওয়ালা গুরু আছে, সেটা বস্তুত .... না, না খারাপ কথা নয়। মোদ্দা কথা, এযাবৎ সাধুদের কাছে বেশী না ঘেষলেও নীলদার সাধুবাবাকে বেশ পছন্দ হয়েছিল তার। ধর্ম টর্মের কথা বলেনি বললেই চলে, কত গল্প করল শীর্ষর সঙ্গে, গঙ্গায় স্নান করল একসঙ্গে সাঁতার কেটে, এমন কি শীর্ষ আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলো দুপুরে ভাতের সঙ্গে মাছও খেতে দিল মাইরি, এই না না মাইরি নয়, মাইরি নয়। যাওয়া থেকে শীর্ষর একটা জিনিসে খুব অবাক লেগেছিলো। নীলদা টা একদম চুপ মেরেছিলো, পরে শীর্ষ বুঝেছে, নীলদা আসলে তাকে আর সাধুবাবাকে মেশবার সুযোগ দিচ্ছিল, শীর্ষ পরে এও বুঝেছে নীলদা আর সাধুবাবা রীতিমত প্ল্যান করেই তাকে টেনে

নিয়ে গিয়েছিল ফলতায়, কিন্তু কেন ? সেটা শীর্ষ এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। শুধু চলে আসবার সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিলো। শীর্ষ যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলো, তখন সাধুবাবা হঠাৎ তাকে ডেকে উঠেছিল, ''শীর্ষেন্দু !''

শীর্ষ পিছন ফিরতেই সাধুবাবা ফের বলে উঠেছিল, ''আমার একটা উপকার করতে পারবে শীর্ষেন্দু ?''

শীর্ষ অবাক হয়েছিল, ''বলুন !''

''এখন থেকে দুটো কাজ আর করোনা। এক, মিথ্যা বলোনা, আর দুই, কথা বলবার সময় কোনও নোংরা ভাষা প্রয়োগ করোনা ''। শীর্ষ আকাশ থেকে পড়েছিল। যা বাব্বা ! হঠাৎ তাকে সাধুবাবা তাকে এ'সব করতে বলছে কেন ? আর সে করলেই বা সাধুবাবার কি উপকার হবে ? প্রশ্নটা করেই ফেলেছিল, ''যদি আপনার কথাগুলো শুনি, তাতে কি হবে ?''

— ''মঙ্গল'' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিল সাধুবাবা,

— ''কার ?''

এ' প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া যায়নি শুধু একটা মিষ্টি হাসি ছাড়া। কি জানি কি মনে হয়েছিল তখন, কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে শীর্ষ সাধুবাবার দিকে মুখ তুলে বলেছিল, ''বেশ''।

সাধুবাবা একটু এগিয়ে এসে শীর্ষর বাঁ কাঁধে হাত রেখেছিল, তারপর আরেকবার খুব মিষ্টি হেসে বলেছিল, ''জানতাম। এসো এবার।''

শীর্ষ এবার ধরফড় করে খাট থেকে নেমে পড়ল। সামনেই আগের আমলের পেল্লাই এক আয়না। শীর্ষ খুঁটিয়ে নিজের চেহারাটা দেখল। আগের চেয়ে ভেঙে গেছে শরীরটা। বেশ রোগা হয়ে গেছে সে। আসলে, রুমকিটা মরে যাওয়ার পর থেকে ব্যায়াম-ট্যায়াম গুলো একদমই ছেড়ে দিয়েছে শীর্ষ। শীর্ষ হঠাৎ ভানুদাকে মনে পড়ে গেল। তার চেহারার খুব প্রশংসা করত ভানুদা, বউদিকে বলত, ''দেখেছো, আমি এখন খোদার খাসি হলে কি হবে, আমার চেলার বডিটা দেখেছো ? পুরো ধর্মেন্দর।'' ওফ্, ধর্মেন্দ্রর খুব ভক্ত ছিল ভানুদা। ইস্, ভানুদাটাও কেমন দুম করে চলে গেল। শীর্ষর মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। শীর্ষর এখন বিউটির কাছে যেতে খুব ইচ্ছা করছে। আজকাল মন খারাপ লাগলেই শীর্ষর বিউটির কথা মনে পড়ে।

বিউটির ঘরে ঢুকেই শীর্ষ চমকে গেল। অপরিসর ঘিঞ্জি ঘরটায় টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। কিন্তু তাতেও বিউটির গাল আর কপালের কালসিটেগুলো নজর এড়াল না শীর্ষর।

— ''কি করে হল এ'সব ?'' বিউটির দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে শীর্ষ খুব শান্ত স্বরে রাখল প্রশ্নটা যেন উত্তর টা তার জানা। বিউটির মুখটা দ্রুত নিচু করে নিল মুখে কোনও উত্তর দিল না, গোটা শরীরটা শুধু ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

''কে করল এটা ? ভোঁদড় ?'', শীর্ষ আবার প্রশ্ন করল। শীর্ষ বুঝতে পারছে তার মাথার দুদিকের রগ ক্রমশঃ ফুলে উঠছে। বিউটি মুখটা যেন তুলতে পারছে না, কোনও রকমে ওপর থেকে নিচে করল মাথাটা।

— ''কেন ?'' শীর্ষর স্বর ক্রমশঃ হিসহিসিয়ে আসছে। শীর্ষর স্বরটা বদলে যেতে বিউটি চকিতে মাথা তুলল। সে তার বুদ্ধি দিয়ে খুব দ্রুত বুঝে নিল শীর্ষকে যদি সামলে রাখতে হয়, তবে ঘটনাটি আর আড়াল করে লাভ নেই, তারচেয়ে যতটা পারা যায়, বলে দেওয়াই ভালো। ''শুতে চেয়েছিল, রাজী হইনি'', বিউটি মুখ খুলল।

''শুলি না কেন ? টাকা পাবি না বলে ? ভোঁদড় আবার কবে টাকা দেয় তোকে। শুতে পারতিস তো, তাহলে মিছিমিছি মারটা খেতিস না'', শীর্ষর গলা অসহিষ্ণু শোনালো।

— ''আমার ভালো লাগেনা ''।

— ''কি ভালো লাগেনা ?''

বিউটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তরটা দিল শীর্ষর চোখে চোখ রেখে

''তোমার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে শুতে'' ।

শীর্ষ হতভম্ব হয়ে গেল । এমন একটা উত্তর আশা করেনি সে । শীর্ষ ধীরে ধীরে খাটের ধারে বসে পড়ল । বিউটি কি তাকে ভালোবেসে ফেলেছে ? এতটাই যে তার জন্য বিউটি ভোঁদড়কেও ফিরিয়ে দিতে পারে । ভোঁদড় এ' তল্লাটের নাম করা মস্তান । কথায়-কথায় ছোরা চাকু চালানোটা ভোঁদড়ের কাছে জলভাত । এ' পাড়ার সব মেয়েরা ভোঁদড়কে টাকার সঙ্গে সঙ্গে ভোঁদরের ইচ্ছমতো দেহ দিতেও বাধ্য থাকে । ভোঁদড়কে জমের চেয়েও ভয় করে তারা । দেহভোগ করবার সময় মেয়েগুলোকে নিপীড়ন করবারও একটা বিশ্রী প্রবণতা আছে ভোঁদড়ের । বিউটির মুখেই শীর্ষ শুনেছে, সম্ভোগের সময় একবার বিউটির যোনিতে সিগারেটের জ্বলন্ত অংশ চেপে ধরেছিল ভোঁদড় । সে কথাটা এখন মনে পড়তে শীর্ষর মাথাটা দপ্ করে জ্বলে উঠল । শীর্ষ জানে, ভোঁদড়কে এখন কোথায় পাওয়া যাবে । আশ-পাশেই অন্য কোনও মেয়ের ঘরে আছে জানোয়ারটা । শীর্ষ ছটফটিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল ।

— ''কোথায় যাচ্ছো ?'' বিউটি উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করল ।''

— ''আসছি দাঁড়া'', শীর্ষ দরজার দিকে এগোল ।

— ''না, যাবে না তুমি । কোনও গন্ডগোলে জড়াবে না ওই গুন্ডাটার সঙ্গে'', বিউটি ছুটে দরজা আগলে দাঁড়ালো । ''কেন ? যাবো না কেন ?'' শীর্ষর এবার বিউটির উপরই রাগ হতে শুরু করছে ।

''আমি বলছি তাই'', আশ্চর্য্য শান্ত গলায় বিউটি শব্দগুলো উচ্চারণ করে, ''আমায় তুমি ভালোবাসো, তাই আমার সব কথা শুনবে । ভালোবাসলে কথা শুনতে হয় ।'' একটু চুপ করে থেকে বিউটি আবার বলতে থাকে, ''শীর্ষ, যা কোনওদিন পাওয়ার ছিল না, তাই পাচ্ছি । তুমি কোনও ভাবেই সেটা কেড়ে নিওনা, যে যা করছে করুক'' । শীর্ষ আস্তে আস্তে আবার দেহটা ছেড়ে দেয় বিছানার উপর । মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে তার । যা বাব্বা ! সে কি সত্যিই ভালোবাসছে নাকি মেয়েটাকে ? এ'সব কি হচ্ছে তার জীবনে ? শীর্ষ মিত্তির আর খারাপ কথা বলবে না । শীর্ষ মিত্তির একটা মেয়েকে ভালোবাসছে, দুর ! কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না । রুমকিটা যে কোথায় চলে গেল এর মধ্যে ? শীর্ষ অসহায় ভাবে বিউটির দিকে তাকালো ।

# # #

বেশ কিছুক্ষণ হল মহানগরীর বুকে সন্ধ্যা নেমে এসেছে । এই সময়টায় এ' শহরে বড় অচেনা, বড় অদ্ভুত এক খেলা চলতে থাকে রাজপথদের আর শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটির মধ্যে । ঘরে ফিরতে থাকা মানুষজনের তাড়ায়, বিভিন্ন যানবাহনের সুতীব্র চিৎকারে শেষ দুপুর আর বিকেলের সাময়িক আলস্য ঝেড়ে ফেলে ক্রমশ ঃ চঞ্চল হয়ে উঠতে থাকে রাজপথেরা, তাদের শরীর জুড়ে হাজার আলোর দল দামী গয়নার মত ঝলমলিয়ে ওঠে । ঠিক তারই বিপরীতে সারাদিনের চলার ক্লান্তি গুটিয়ে ভারী শান্ত হয়ে যেতে থাকে প্রাচীন নদীটি । তার বুকে সারাদিন ভাসতে থাকা মাছধরা নৌকাগুলো বিশ্রামের আশায় ঘাটে-ঘাটে এসে দাঁড়ায় । বাবুঘাট থেকে ফেয়ারলি প্লেসের অংশটুকু লঞ্চ চলাচলে ব্যস্ত থাকলেও তা নদীজুড়ে থাকা সমগ্র আবেশটিকে ক্ষুন্ন করতে পারেনা । আর প্রিন্সেপ ঘাটের দিকের অংশটি এমনিতে দিনের বেলাই শান্ত থাকে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে যেন সেই শান্ত ভাবটি আরও বেড়ে যায় । এ' শহরে আজও যারা নদী ভালোবাসে, তারা ঐ সময়টায় ইতি উতি পাতা থাকা সিমেন্টের বেঞ্চ গুলোতে বসে নদী দেখে, নদীর সঙ্গে নিজেদের সুখ দুঃখ ভাগ করে নেয় ।

এই মুহূর্তে ঠিক তেমনই একটি বেঞ্চে নদীর দিকে মুখ করে স্থিরভাবে বসে আছে দুটি মানুষ । এমন নিশ্চলভাবে পাশাপাশি বসে আছে তারা যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝিনা কোনও শিল্পী আপন খেয়ালে ওই বেঞ্চের উপড় দুটি মূর্তি গড়ে দিয়ে গেছেন ।

এই মুহূর্তে ঠিক তেমনই একটি বেঞ্চে নদীর দিকে মুখ করে স্থিরভাবে বসে আছে দুটি মানুষ। এমন নিশ্চলভাবে পাশাপাশি বসে আছে তারা যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝিনা কোনও শিল্পী আপন খেয়ালে ওই বেঞ্চের উপড় দুটি মূর্তি গড়ে দিয়ে গেছেন।

মানুষ দুটি কথা বলছেনা কোনও নিজেদের মধ্যে, এমনকি তাকাচ্ছেও না পরস্পরের দিকে। দু'জনের মুখেই ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট, দেখলেই মনে হয় যেন সারাদিন ধরে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লড়ে এসেছে তারা। একটা মৃদু হাওয়া নদী থেকে উঠে এসে দ্রুত ছুঁয়ে দিল তাদের। মানুষ দুটির মধ্যে যে নারী, এ' হাওয়ায় তার চুল কিছু এলোমেলো হয়ে কপালে এসে পাড়াতে সে ডান হাত তুলে সেই অবাধ্য চুলগুলোকে সরালো। আর তার সেই নড়াচড়াতেই বুঝি সম্বিত ফিরে পেল পাশে বসা পুরুষটিও। সে কথা বলতে আরম্ভ করল সামান্য অস্ফুটে,

— ''শ্রী, তবে কি হেরে যাওয়ার সময় এসে গেল ? এত তাড়াতাড়ি ? উত্তরে শিঞ্জিনি কোনও কথা বললনা শুধু বাঁ হাতটা বাড়িয়ে নীলের ডান হাতের উপর রাখল। এ'সময়টায় কোনও কথা বলতে চাইছে না সে, নিজের মানসিক অবস্থা দিয়ে অনায়াসেই নীলের চরম অসহায়তা অনুভব করতে পারছে শিঞ্জিনি। বলুক, নীলই কথা বলুক, চরম আঘাতের মুহূর্ত আসবার আগে যতটা সম্ভব হালকা হোক ও।

নীল অসহিষ্ণু ভাবে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। চরম আবেগ স্থির হতে দিচ্ছে না তাকে। কি এক তোলপাড়, কি ভীষণ আলোড়ন — নীল দু' পা এগিয়ে একটু ঝুঁকে সজোড়ে চেপে ধরল সাদা সিমেন্টের রেলিংটাকে। আজ এক সপ্তাহের উপর হয়ে গেল জয়িতা আই.সি.ইউ. তে। এক সপ্তাহ আগে মাঝরাতে তুমুল জ্বর এসেছিল জয়িতার। মাঝে মাঝেই সংজ্ঞা হারাচ্ছিল সে, কথা-বার্তায় অসংলগ্নতা টের পাওয়া যাচ্ছিল। সারারাত পাপানকে নিয়ে জয়িতার মাথার কাছে বসেছিল নীল, ডাক্তারবাবুর দেওয়া ঔষধ খাইয়েও কোনও মতেই সুবিধা করা যাচ্ছিল না, শেষে বাধ্য হয়েই ভোর বেলা শিঞ্জিনিকে ফোনে ডেকেছিল নীল আর জয়িতাকে সোজা নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেছিল মধ্য কলকাতার এই নার্সিংহোমের আই.সি.ইউ. তে। ভর্তি করবার পরে চব্বিশ ঘন্টার মতো হালকা সংজ্ঞা ছিল, তারপরই কোমায় চলে যায় জয়িতা। ব্যস, সেই থেকে আর সংজ্ঞা ফেরেনি। দিন দিন অবস্থা খারাপই হয়েছে শরীরের, শেষে গতকাল সন্ধ্যা থেকে জয়িতাকে ভেন্টিলেশনে দিয়ে দিতে হয়েছে। এই একসপ্তাহ ধরে নীল, পাপান, জয়িতার মা-র সঙ্গে নার্সিংহোমকে ঘরবাড়ি বানিয়ে রয়ে গেছে শিঞ্জিনিও। তারা সবাই পালা করে নার্সিংহোমে উপস্থিত থাকে, বেশীর ভাগ সময়ে সবাই মিলেই। এই ক'দিন অনিয়মের জন্যই বোধহয়, পাপানটার সকাল থেকে বেশ জ্বর এসে গেছে। পাপান অবশ্য সে অবস্থাতেই আসতে চেয়েছিল, শিঞ্জিনি আটকেছে। জয়িতার মা কে পাপানের পাহারায় রেখে আজ তারা দুজনেই নার্সিংহোম সামালাচ্ছে। আজ বিকেলের দিকে একজন বড় ডাক্তার আনা হয়েছিল, তিনি রোগী দেখে কোনও কথা বলেননি, শুধু নীলকে মন শক্ত করবার উপদেশ দিয়ে চলে গেছেন।

''যদি চলে যায়, আমার অনেকটা চলে যাবে শ্রী''

নীল কিছুটা সামলাতে পেরেছে, তার গলার স্বরে সে আভাস পেতে শিঞ্জিনিও উঠে এসে নীলের পাশে দাঁড়ায়, ''ও ভাবে ভেবোনা নীল। হারবার আগে হেরে যেতে নেই সোনা। আর তাছাড়া, প্রিয়জনেরা আমাদের ছেড়ে কোথাও যায় না নীল''।

''যায়না ?'' নীল অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে শব্দটা।

''না, নীল যায়না, যেতে পারেনা। ভেবে দ্যাখো, জয়িতা যদি চলেও যায়, কি যাবে নীল? ওর কষ্ঠ পেতে থাকা দেহটাই তো, তার বেশী তো কিছু নয়, কিন্তু ওর স্মৃতিগুলো ? ওর সঙ্গে কাটানো আমাদের মুহূর্তগুলো ? সেগুলো তো আমাদের সঙ্গে থেকেই যাবে, তাই না নীল ? মানুষের বেঁচে থাকা তো এই মুহূর্ত গুলোতেই, তার চেয়ে বেশী কিছু তো নয়'', একটা ঘোরের মধ্যে কথাগুলো বলে যেতে যেতে শিঞ্জিনি টের পায় নীল স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নীলের দুচোখে টলটল করছে জল, এমন জলেদের নামই বোধহয় অশ্রু হয়। শিঞ্জিনি নীলের আরেকটু কাছে এগিয়ে যায়, ''নীল তুমি কাঁদছো ? কেঁদোনা। সয়ে নিতে হয় নীল, সবকিছু সয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়'', শিঞ্জিনি গঙ্গার উপর দৃষ্টি ঘোরায়,

''দ্যাখো, সব পলি, সব আবর্জনা সয়ে নিয়েছে বলেই গঙ্গা আজও বয়ে চলেছে। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে কত নদীই পলি, আবর্জনা সহ্য করতে না পেরে হারিয়ে গেছে। মানুষকে গঙ্গার মত হতে হয় নীল, বয়ে যেতে হয় কারণ জীবনের ধর্মই তাই। জীবন মানে তো কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকা নিছক একটা দেহ নয় নীল, জীবন মানে বোধ, চেতনা আর অনন্ত শক্তির নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বয়ে যাওয়া, এক দেহ থেকে আরেক দেহে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে এক নশ্বর প্রাণ থেকে আরেক নশ্বর প্রাণে। আমরা জীবিত বটে, কিন্তু কেউই জীবন নয় নীল, আমরা জীবনের প্রতীক মাত্র, আসল জীবন তো আমাদের অলক্ষ্যে প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে''।

''শ্রী !'', নীল হঠাৎ শিঞ্জিনিকে থামিয়ে দেয়, ''শ্রী! তুমি থাকবে তো সারাজীবন আমার পাশে এইভাবে ?'' শিঞ্জিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, তারপর যেন খুবই স্বাভাবিক ও সাধারণ জানা একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, সেইভাবে বলে, ''থাকবো নীল, থাকবো, নিশ্চয় থাকবো। যদি জানতাম জয়িতা এখনও অনেকদিন আছে তোমার জীবনে, তবে এত নিশ্চিত করে বলতে পারতাম না, কিন্তু আজ যখন ভবিতব্য চোখের সামনে স্পষ্ট, তখন আরও একটা সত্য আমার জীবনে স্পষ্ট যে তোমার জীবনে আমাকে থাকতেই হবে। এ' আমার ভালোবাসা নয় শুধু নীল, এ' আমার দায়িত্ব। এ' দায়িত্ব জয়িতাই আমাকে দিয়ে যাচ্ছে। জয়িতাকে আমি খুব ভালোবাসি নীল, হয়তো স্বাভাবিকভাবে তেমন ভালোবাসবার কথা নয়, তবুও বাসি। আর ওই মেয়েটাও, কেন জানিনা বড় ভালোবেসেছে আমাকে, বড় আঁকড়ে ধরেছে। ওর চোখে আমি ভরসার আকুতি দেখেছি নীল, আমিও আমার দৃষ্টি দিয়ে সে ভরসা ওকে দিয়েছি, আমি জানি, ও সেটা বুঝেছেও''।

''মানে ?'' নীল বিস্ময় প্রকাশ করে।

শিঞ্জিনি একটু হাসে, তারপর মৃদু স্বরে বলে, ''ও মেয়েদের ব্যাপার নীল, তুমি পুরুষ হয়ে বুঝবেনা''।

— ''হয়তো। তবে ঠিকই বলেছ, জয়িতা তোমায় খুব ভালোবাসে''।

— নীল একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে ওঠে, ''আর তোমার কথা তুললামই না, ভালোবাসা তোমার পবিত্র ধর্ম''। হঠাৎ দুজনেই যেন চুপ করে যায়। বেশ কিছু মুহূর্ত হু হু করে বয়ে যেতে থাকে ওদের আশপাশ দিয়ে। গভীর আবেগে ডুবে যেতে যেতে যেন নিজেকে জোর করে টেনে তোলে শিঞ্জিনি, খুব আস্তে বলে ওঠে, ''নীল, আমি আছি''।

হঠাৎ নীলের পকেটের মোবাইলটা বেজে ওঠে। নীল মোবাইলটা হাতে নিয়ে স্ক্রিনের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর একটা আলতো 'হ্যালো' বলতে বলতে ফোনটা কানে চেপে ধরে। ওপাশ থেকে কিছু কর্কশ যান্ত্রিক শব্দ, এ'পাশে স্থির নীল, শিঞ্জিনির অসহায় লাগে, তবে কি ? শিঞ্জিনি দু' একপা পিছিয়ে বেঞ্চটায় আবার বসে পড়ে।

মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে নীল মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ মাটির দিকে কি যেন দেখে, তারপর এক ঝলক নদীর দিকে তাকিয়ে দ্রুত শিঞ্জিনির দিকে ফিরে শান্ত গলায় বলে, ''শ্রী, চলো ডাকছে''।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী — পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

সৌমিক বসু

"অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় দু:খিত"

অনেকে বলেন, চল্লিশ পেরোলেই চালশে। যত বয়স বাড়ছে, ছুটির দিনে ঠেকে বসে গল্প বলার প্রবণতা বাড়ছে। পুরনো সব স্মৃতির চর্বিতচর্বণ, চিলেকোঠার জঞ্জাল ঘেঁটে খুঁজে পাওয়া গেল এক চিলতে পুরোনো কৈশোর, যেখানে ছাদভর্তি অ্যান্টেনার কাঁটাতার থেকে আনমনে ঝুলে আছে এক পশলা অন্য সময়। কিছুটা আশি আর মূলত নব্বই এর দশক। আমার মত কিছু মানুষের নিজস্ব সময়। বেখেয়ালে যখন পিছনে চেয়ে দেখলাম তখন হাত ছাড়িয়ে বহুদূরে, হুড়মুড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে সময়টা। সাধে কি আর সুকুমার রায় হ-য-ব-র-ল তে লিখেছিলেন, চল্লিশে পৌঁছে বয়সটা ঘুরিয়ে দিতে হয়। নইলে "শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি !"

অ্যান্টেনার কথা উঠল যখন, একটু সেই ফেলে আশা সময়, দূরদর্শন, বোকা বাক্স আর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিনোদন নিয়ে দুইকথা লেখার চেষ্টা করি। টেলিভিশন, মাল্টিপ্লেক্স হয়ে ওঠেনি। বিনোদনের চাবিকাঠি এখন ভার্চুয়াল দুনিয়ায়। কয়েক দশক আগে এই একচ্ছত্র জায়গায় ছিল শুধু দূরদর্শন। বাষট্টি বসন্ত পূর্বে ১৯৫৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে পরীক্ষামূলক ভাবে যাত্রা শুরু করেছিল দূরদর্শন, ইউনেস্কো-র ২০০০০ ডলার সাহায্য এবং ফিলিপস-এর উপহার দেওয়া ১৮০ টি টেলিভিশন সেট-এর হাত ধরে। এই মাধ্যম এখনও আমাদের মতন স্মৃতিমেদুর প্রজন্মর কাছে নস্টালজিয়ার আকর। চোখ রাখা যাক দূরদর্শনকে ঘিরে থাকা কিছু জানা-অজানা তথ্যে।

শুরুতে সপ্তাহে দু'দিন, এক ঘণ্টা করে দূরদর্শনে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হত। দিল্লি এবং এর চারপাশে ৪০ কিমি দূরত্ব অবধি দেখা যেত দূরদর্শন। ১৯৬৫ থেকে সংবাদ সম্প্রচার শুরু করে দূরদর্শন। প্রথম সংবাদপাঠিকা ছিলেন প্রতিমা পুরী। সংবাদের বিষয়বস্তু সেই সময় তারা পেত অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে। ১৯৭৫-এ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার জনক ড: বিক্রম সারাভাই পরামর্শ দেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্যাটেলাইট বা ইনস্যাট প্রেরণের, যাতে দূরদর্শনের সিগন্যালকে পৌঁছে দেওয়া যায় দেশের সব প্রান্তে। অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে দূরদর্শন আলাদা হয়ে যায় ১৯৭৬-এ। সে বছর থেকেই বিজ্ঞাপন দেখানো হতে থাকে এই মাধ্যমে। ১৫ অগাস্ট, ১৯৮২ তে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ঈন্দিরা গান্ধী'র ভাষণের মাধ্যমে প্রথম চালু হয় রঙীন সম্প্রসারণ। ১৯৮২ তে দিল্লী এশিয়ান গেমস সরাসরি প্রচার করে দূরদর্শন এবং ঘরে ঘরে প্রবল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সবার ঘরে তখন রঙীন টিভি পৌঁছয়নি, সাদা-কালো টিভিই তার বনেদিয়ানা ধরে রেখেছিল মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের হৃদয়ে। আর ছোট-বড় যাই হোক, ঘরে একখানা "টিভি" থাকলে, নিজেদের বৈভব জাহির করা যেত না, একথা মোটেও হলফ করে বলা যাবে না। যাদের ঘরে টিভি ছিল না, তারা ভিড় জমাত পরিচিত কারও ঘরের সাদাকালো টিভির সামনে। সেখানেই চমৎকার সহাবস্থান করতেন দিদিমা, জেঠিমা, পাশের বাড়ির বউদি, কাজের দিদি, বাদাম, চানাচুর-মুড়ি-চা শোভিত আপিসবাবু .... কে থাকতেন না সেই লাইনে ?

বৈচিত্রের মধ্যেও চমৎকার ছিল সেই ঐক্য, একেবারে "মিলে সুর মেরা তুমহারা" পরিবেশ। তার মধ্যে বাঙালির আড্ডা, কূটকাচলি কি না চলতো, ববির ঋষি কাপুর থেকে উত্তমকুমার, সানির লেট কাট, জিমি অমরনাথের হুক, মারাদোনার ফুটবল স্কিল, বরিস বেকারের অ্যাথলেটিসম, দুনিয়ার যে কোন রকম সম্ভাব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতো ।

মনে পড়ে, শুরুর দিকে সন্ধ্যা ৫ টার আগে থেকে টিভির সামনে অধীর আগ্রহে বসে থাকা, স্ক্রীনে তখন সাদা-কালোয় ডোরাকাটা কিছু স্ট্রাইপ। তারপর সেই অমোঘ মুহূর্ত, পর্দায় ভেসে ওঠে ডিডি-আই লোগো, সাথে সেই মন কেমন করা আবহ সংগীত। সত্যি যেন এক মহাজাগতিক পরিবেশ, বহু দূর হতে হাজার হাজার নক্ষত্র, ছায়াপথ পার হয়ে এক অন্য জগতের সাথে যেন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো এই অসাধারন "ডিডি আই" লোগোটি

এনআইডির প্রাক্তন ছাত্র দেবশিস ভট্টাচার্য ডিজাইন করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে পন্ডিত রবিশঙ্করের সাথে উস্তাদ আলী আহমেদ হুসেন খান রচনা করেছিলেন এই সুরটি, যেটি আসলে সানাই এর মাধ্যমে "সারে জাহান সে আচ্ছা" গানের উপস্থাপনা। এই ধীরলয়ের সংগীতের অংশটি আমাদের মতন আশির দশকে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের জাছে একটি সযত্নে লালিত স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে। অথচ মনে আছে সেই দিনগুলিতে আমরা বাচ্চারা এই সুরটি বিশেষ পছন্দ করতাম না এবং অপেক্ষা করতাম কতক্ষণে এটি শেষ হবে, যাতে পরবর্তী অনুষ্ঠান শুরু হতে পারে। আজও আপনার চোখ বন্ধ করে এই সুরটি শুনলে আপনি ফিরে যেতে পারেন সেই স্বর্ণযুগে, যখন নকল টিআরপি এবং ব্রেকিং নিউজের অন্ধ প্রতিযোগিতা ছিলো না। জীবন ছিল অনেক সরল এবং সাধারণ, জীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ্য, চাওয়া পাওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ, সামাজিক প্রতিপত্তি শেষ কথা বলতো না।

সরকারি মাধ্যাম এবং মূলত পরিবারভিত্তিক এবং কিছুটা রক্ষণশীল মাধ্যাম হলেও শুধুমাত্র বিষয়ের উৎকর্ষে এখনকার বহু ডিটিএচ চ্যানেল বা OTT প্ল্যাটফর্মকে ১০ গোল দেওয়ার ক্ষমতা রাখতো সেই সময়ের দূরদর্শন। বহু কালজয়ী বিদেশী ভাষার ছবি প্রথমবার দেখেছি ডিডি-২ এর শনিবারের রাতের স্লটে। সত্যজিতের "সদগতি", তপন সিনহার "আদমি অউর অওরত"এর মতোন টেলিফিল্ম নির্মিত হয়েছিল দূরদর্শনের অর্থানুকুল্যে ।

১৯৭৬-এ প্রথম ধারাবাহিক "লড্ডু সিং ট্যাক্সিওয়ালা" সম্প্রচারিত হয় দূরদর্শনে। এরপর ক্রমশ "হমলোগ", "বুনিয়াদ", "তামস" সহ বহু কালজয়ী ধারাবাহিক উপহার দিয়েছে এই মাধ্যম। বিনোদ নাগপাল, রাজেশ পুরী, সুষমা শেঠ, দীপা শাহি, অনিতা কানওয়ার এর মতোন একঝাঁক প্রতিভাবান ও ক্ষমতাশালী অভিনেতার জন্ম দিয়েছিল দূরদর্শন । আবার শফি ইনামদার, স্বরূপ সম্পত, রাকেশ বেদী, সতীশ শাহ, টিকু তালসানিয়া এবং সুলভ আর্যের মতোন অভিনেতারা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন "ইয়ে যো হ্যায় জিন্দেগী" ধারাবাহিকের মাধ্যমে। বহু চরিত্র হয়ে ওঠে "লার্জার দ্যান লাইফ"। প্রিয়া তেন্ডুলকরের "রজনী", পঙ্কজ কাপুর ও কীটু গিদওয়ানির "করমচাঁদ", "মালগুড্ডি ডেজ" এর স্বামী, রঘুবীর যাদবের "মুঙ্গেরীলাল কে হাসিন সপনে", অঞ্জন শ্রীবাস্তবের "ওয়াগলে কি দুনিয়া"র নাম আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। আবার যশপাল ভাট্টির "ফ্লপ শো", "উলটা পুলটা" র মতোন ব্ল্যাক কমেডি একসময় সমৃদ্ধ করেছে দূরদর্শনকে । তবে রামানন্দ সাগরের "রামায়ণ", বি আর চোপড়ার "মহাভারত" যেভাবে জনমানসে প্রভাব ফেলেছিল, তার পুনরাবৃত্তি ভারতবর্ষের বিনোদন জগতের ইতিহাসে আর হয়েছে বলে মনে হয় না। সেই সময় প্রতি রবিবার ধারাবাহিক দুটির নির্দিষ্ট সময়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত অঘোষিত কারফিউ জারি হয়ে যেতো, রাস্তাঘাট শুনসান, দোকানবাজার জনশূন্য, টিভির দোকানের সামনে সারি সারি মানুষ ... এই ছিলো খুব চেনা ছবি ।

কলকাতা দূরদর্শনও মোটেও পিছিয়ে ছিলো না, "তেরো পার্বণ", "সেই সময়", "বিবাহ অভিযান", "আবার যখের ধন", "জন্মভূমি", "জননী" র মতোন ধারাবাহিকের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরতো। "হরেকরকমবা", "ছুটি ছুটি", "সাপ্তাহিকী", "চিচিং ফাঁক" এর ভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠানও আমাদের স্মৃতির সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে ।

অভিভাবকদের বেশিরভাগ তখন সন্তানদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার জন্যে টিভি দেখতে কার্যত একপ্রকার বারণ করতেন। "আমার ছেলে-মেয়ে কিন্তু টিভি একদম দেখে না।" এই কথাগুলো বলে লেখাপড়ায় ভাল কোনও ছেলে বা মেয়ের অভিভাবকদের বেশ একটা আত্মতৃপ্তি পেতেন। সেই আমলে খুব সম্ভবত সন্ধ্যা ৮টা বাজলে দূরদর্শন এর সম্প্রচারের ব্যাটন "দিল্লী চলো" বলে "Over to Delhi" হয়ে যেতো আর আমাদের মতোন ছেলেপুলেদের গুটিগুটি টিভির ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হোতো । এসব সত্তেও সেই বয়সে ছেলে ছোকরাদের (মেয়েদের ব্যাপারটা অবশ্য ঠিক জানি না) মধ্যে প্রতি শুক্রবার রাত ১১:৩০ টায় লুকিয়ে চুরিয়ে "গভীর রাতের ছায়াছবি" দেখার যে উন্মাদনা ছিলো, তা বলে বোঝানোর নয়। তারপর থেকে যুগে যুগে দুষ্টমির, পাকামির সংজ্ঞা বদলেছে, বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে বাঙালি আজ এমন গ্লোবাল হয়ে উঠেছে যে সে ইংরাজী F শব্দ উচ্চারণ না করলে সপ্রতিভ স্মার্টনেসের প্রমান দিতে পারে না। সে এক অন্য প্রসঙ্গ ।

এবার আসি কিছু মানুষের কথায় যারা অভিনেতা, কলাকুশলী না হয়েও আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতা দূরদর্শনের ঘোষিকার ভূমিকায় দীর্ঘদিন আলো করে থাকা শাশ্বতী গুহঠাকুরতা, চৈতালি দাশগুপ্ত এমনই দুইজন মানুষ, সংবাদ পাঠক/পাঠিকাদের মধ্যে দেবরাজ রায়, তরুন চক্রবর্তী, ছন্দা সেন, মধুমন্তী মৈত্র দের নাম একটু ভাবলেই অনেকের মনে পড়বে। আবার ইংরাজী সংবাদ পরিবেশনের দৌলতে সালমা সুলতানার চুলে গোজা গোলাপ, গীতাঞ্জলি আয়ার, রিনি সাইমনের স্টাইলিশ বব কাট চুল রীতিমতোন ফ্যাশন স্টেটমেন্টে পরিনত হয়েছিল। আবার সেইযুগে "সুরভি"-র দৌলতে রেনুকা সাহানের মিস্টি হাসির প্রেমে পড়েনি এমন মানুষ সত্যি খুঁজে পাওয়া বিরল। এরপর প্রনয় রায় এলেন তার ঝকঝকে স্মার্টনেস , NDTV আর "World This Week" নিয়ে । এলেন, দেখলেন, জয় করলেন বলা ভালো। আমরা সাক্ষী রইলাম উপসাগরীয় যুদ্ধ, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে টুকরো হয়ে যাওয়া, বার্লিন প্রাচীরের পতনের মতোন যুগান্তকারী ঘটনার। ভারতীয় মিডিয়ার সাবালক হওয়া সম্ভবত তখন থেকে ।

টিভি দেখতে গিয়ে কতো দর্শক কতো বিড়ম্বনার মুখে পড়েছেন সেই হাসির গল্প লিখতে গেলে আরও একটা গোটা কাহিনী লিখে ফেলা যায়। যাদের বাড়িতে ভোল্টেজ ওঠানামা করতো, কিমবা যাদের ডিসি ফ্যান ছিলো, তারা প্রায়শ অভ্যাস্ত ছিলেন টিভির অভিনেতা/ অভিনেত্রীদের সতী দেহত্যাগের মতোন টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে। আর পুরনো কোলকাতার বারো ঘর এক উঠোন এর বাড়িতে কোন একটি ঘরে এক ভিলেন ডিসি ফ্যান চলে উঠলেই প্রতিবেশীর টিভিতে ছবি কাঁপতে শুরু করতো। চারিদিকে হইচই তাকে খুঁজতে, সঙ্গে সঙ্গে সে ফ্যান বন্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে গেছে। এরকম কতো টম অ্যান্ড জেরির লড়াই এর সাক্ষী থেকেছেন পুরনো কলকাতার কতো মানুষ। আবার কোনদিন একটু বাতাস দিলেই বাঁশ বা কোনও লোহার স্ট্রাকচারের সাথে বাঁধা এন্টেনা ঘুরে যেত। ছবিরও বারোটা বাজা। আবার ছাদে ওঠা, এন্টেনা বিভিন্ন অ্যাঙ্গলে ঘোরানো, নীচের লোককে ছাদ থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করা ছবি ভাল হচ্ছে কিনা। সে গ্রীন সিগন্যাল দিলে আবার নীচে এসে বসা আর একটু পরে আবার দমকা হাওয়া, আবার এন্টেনা ঘুরে যাওয়া। কার্যত টিভি দেখা, আর বাতাসের সাথে যুদ্ধ করে এন্টেনা ঠিক পজিশনে সেট করা ছিল একপ্রকার গৃহযুদ্ধ। আবার একেবারে প্রথম প্রজন্মের টেলিভিশন সেট এ খেলা সন্ধের দিকে গড়ালে খেলোয়াড়দের মুখ ভাল বোঝা যেত না। ব্রাইটনেস আর কনট্রাস্ট মেলাতে-মেলাতে দমবন্ধ অবস্হা। কেউ কেউ আবার এতোটাই সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, এতো উচ্চ ভল্যুমে টিভি চালিয়ে রাখতেন, সারা পাড়ার টিভি না চালালেও চলতো। আর সবশেষে ছিলেন মুর্তিমান বিনয়ের অবতার তিনি, জমজমাট অনুষ্ঠানের মাঝে চরম অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স "অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় দু:খিত", বা "রুকাবত কে লিয়ে খেদ হ্যায়" বা "Sorry for the interruption"। সব মিলিয়ে সারা পাড়াশুদ্ধ টিভি দেখার সময়টা আমার কাছে একটা সাংঘাতিক রঙীন ক্যানভাস, যা আজকের স্মার্টফোন ব্যাবহার করা প্রজন্মকে ঠিক বোঝানো যাবে না ।

ভাবতে অবাক লাগে, আসলে দূরদর্শনকে আলাদা গণমাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠার পিছনে মূল কারণ ছিল দেশের "জরুরি অবস্থা"। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে এই বিশেষ আপৎকাল ঘোষণার দেড় মাস পর যার সূচনা, সরকারি বিশ দফা কার্যক্রমের প্রচারের মুখপত্র হিসাবে। আজ পিছন ফিরে তাকালে যান্ত্রিকতায় পরিপূর্ণ জীবনে এক পশলা শান্তি দেয় সাদাকালো টেলিভিশনের বর্ণিল স্মৃতি। চারকোণা ম্যাজিক বাক্সের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদেরও কতো স্মৃতি, আবেগ, কতো অনুভূতি। একবার খুললে প্যান্ডোরা বাক্সের মতোন এক এর এক বেরিয়ে আসতে থাকে ।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ : এই লেখা নিতান্তই আশি, নব্বই দশকের স্মৃতিমেদুরতার ফসল। এই সময়ের পরে যাদের বেড়ে ওঠা, তাদের পক্ষে এই লেখায় বর্ণিত সময়ের সাথে সম্পর্কস্হাপন কষ্টকর । সেক্ষেত্রে আজকের স্ফাস্ট, স্মার্ট লাইফে এক আনস্মার্ট বোকা বাক্সের ধূসর গল্প ফাঁদাটাকে এক টুকরো "অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় দু:খিত" হিসাবে ধরে নেবেন ।

সৌমিক বসু – পেশাগত ভাবে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, নেশাগত ভাবে পাঠক। কর্মসূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসী জীবন অতিবাহিত করলেও, ফিরে ফিরে গিয়েছেন কলকাতায়, বাংলা ভাষার টানে। ২০১৮ সান থেকে স্হায়ীভাবে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বাসিন্দা। পেশাগত ব্যস্ততার মাঝে অবসর সময় অনেকটা কাটে সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্য চর্চায় । লেখক হিসাবে বিচরণ মূলত প্রবন্ধ ও রম্যরচনায় ।

অর্পিতা চ্যাটার্জি

গল্প লেখার গল্প

প্রিয় সম্পাদিকা,

বহুকাল আগে আপনি এই অধম লেখিকাকে একখানি লেখা জমা দিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সে নির্দেশে অবিশ্যি এতকালে তামাদি হইয়া যাইবারই কথা। তবু সে লেখা লিখিবার বা না-লিখিবার "গল্প" শুনাইতে মন করিতেছে। কাহিনী লিখিবারও তো কিঞ্চিৎ কাহিনি থাকে। নব্য লেখককুলের করুণ কাহিনি। তেমন কাহিনি লইয়া হেমন্ত-সন্ধ্যার মৌতাতে বান্ধব সহযোগে আলাপ করা চলে, প্রকাশনার আলোকে আসিবার উপযুক্ত সে নয়। তেমনই এক কাহিনির বর্ণনা হেতু এই পত্র।

আপনি তো "লেখো" বলিয়াই দূরাভাষ বার্তাটি শেষ করিলেন। আর সেইক্ষণ হইতেই লেখিকার "গল্প লেখার গল্প"-টি শুরু হইলো। কোন কুক্ষণে লেখিকার এইবার "গল্প" লিখিবার ইচ্ছেটি গজাইয়া উঠিয়াছিল খোদায় মালুম ! বানাইয়া বানাইয়া উষ্টুম-ধুষ্টুম গল্প লিখিতে এই লেখিকা আদতেই যে অপারগ তা পূর্বে বারংবার প্রমাণিত হইয়াছে। লিখিবার উপক্রম করিলেই প্রথম কয়েক লাইনের পর হইতে আর ঘটনা কিছুতেই অগ্রসর হয় না। আগড়ুম-বাগড়ুম ভাবিতে ভাবিতে কালক্ষেপ হয়, কিন্তু প্লট ঢ্যাটা ছেলের মত শত ধমকানিতেও জায়গা ছেড়ে নড়ে না। তবুও কালেভদ্রে কুঁজোরও তো সাধ হয় চিত হইয়া নিদ্রা যাইতে। উপরন্তু ইহা তো আর যাহাই মনে আসিতেছে তাহাই খানিক ভাষা জড়াইয়া "লও, অমৃত ব্যাঞ্জন রাঁধিয়া আনিয়াছি" – বলিয়া পত্রিকার দফতরে পাঠাইয়া দেওয়া নয় ! খোদ সম্পাদিকার নির্দেশ পাইয়া লিখিতে বসা ! অতএব, গল্প লিখিবার পূর্ববর্তী সমগ্র ব্যর্থ ইতিহাস সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া এই লেখিকারও গুছাইয়া একখানি গল্প লিখিয়া সম্পাদিকাকে পাঠাইবার বায়ু ঊর্ধ্বমুখী হইল। তা এখন যে কাজ আপনি প্রত্যহ করিয়া থাকেন, অথবা যে কাজে আপনি পারদর্শী, সেসব কাজ আপনি চক্ষু মুদিয়াও অবলীলায় নিখুঁত করিয়া দিবেন, কিন্তু যে কাজ আপনি প্রত্যহ করেন না সে কাজ শুরু করার আগে আপনি খানিক প্রস্তুতি লইবেন, কিঞ্চিত বেশি ভাবিবেন, নিখুঁত করিতে অতিরিক্ত তৎপর হইবেন। আমা হেন "গল্পলিখিয়ে"-র ক্ষেত্রে বিড়াম্বনা আরও খানিক বাড়ে কারণ, যেহেতু লেখিকা জানে যে সে গল্প লিখিতে পারে না, সেহেতু তার গল্প লিখিবার এবং সে গল্পকে নিখুঁত করিবার অতিরিক্ত নিশ্ছিদ্র একটি প্রচেষ্টা কাজ করে। উপরন্তু "দেখি কেমন গল্প লিখতে না পারি ! এমন কি কঠিন কাজ !" – বলিয়া অবচেতনে নিজের সাথেই একটি অর্বাচীন প্রতিযোগিতায় বেমক্কা সে জড়াইয়া পড়ে। তাতে অবিশ্যি রক্ত গরম হওয়া ব্যাতীত বিশেষ কিছু উপকার হয় না।

তাহা সে যাহাই হউক, এ যাত্রা ভীষণ একখানি গল্প লিখিয়া তবেই ক্ষান্ত হইবে এমন একটি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা লইয়া লেখিকা তো পরবর্তী ছুটির দিন প্রত্যূষকালে উঠিয়া পথের দিকের বাতায়নের সামনে থিতু হইলেন। ভাবটি এমন, যে ওই বাতায়ন পথেই গল্পেরা হুড়হুড় করিয়া তার আঙ্গুল বাহিয়া কি-বোর্ডে ঝড় তুলিবে। বাতায়ন পথে সাড়ে তিনখানি বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। সামনের দুইখানি সম্পূর্ণ, ডাইনে-বামে এবং কোণার তিনখানির অর্ধটুকু করিয়া ধরিলে সাড়ে তিন। তা লেখিকা বাতায়নপথে বসিয়া হাই তুলিতে তুলিতে "গল্প" রান্ধিতে বসিল। প্রথমে সে ভাবিল, এই যে তাহার প্রতিবেশীবৃন্দ তাহাদের লইয়া গল্প ফাঁদিলে কেমন হয়। বেশ একটা প্রাচ্যদেশীয় রমণীর চোখে পাশ্চ্যতের ঘরকন্যা জাতীয় গল্প দাঁড়াইয়া যায়। মনে মনে উত্তেজিত হইয়া হাই কমাইতে বৃহৎ একপেয়ালা কড়া চা লইয়া ভাবিতে বসিল। এই যেমন অনুমান করা যাক বাঁয়ের আমান্ডার কথা, একলাই থাকে, শহরের কোন এক আপিসে চাকুরি করে। রবিবার সকাল হইতে না হইতেই বের হইয়া পড়ে। গির্জার সাপ্তাহিক প্রার্থনা এবং তৎপরবর্তী সাপ্তাহিক বাজার করিয়া ফিরে আসে যখন তখন লেখিকা বাতায়নের সামনে বসিয়া চা পান করে। আর ডাইনের বব, ফুলছাপ জামা, নয় লাল নীল বেঢপ টি শার্ট পরিয়া ঘাস ছাঁটে বা

শীতকালে বরফ পরিস্কার করে। ছেলেপুলে সব ফ্লোরিডায়। সে তার সহোদরার সহিত তাদের মায়ের পুরাতন এই গৃহে বসবাস করে। প্রাথমিক আলাপচারিতায় এটুকুই লেখিকা জানে তাদের সম্পর্কে। গত শীতে একদিন সে দেখিয়াছিল, বিদঘুটে এক তুষার ঝড় শেষে বব এবং আমান্ডা ধূমপান করিতে করিতে রাস্তা কেন এখনও সাফ হইল না সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিতেছে। এই দৃশ্যের কথা মনে করিয়া লেখিকার মাথায় দুরন্ত এক প্রেমের প্লট ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একমুঠো বিস্কুট কচমচ করিয়া চিবাইয়া, একঢোঁক চা দিয়া ক্যোঁৎ করিয়া তাহা গিলিয়া লইয়া লেখিকা খটমট করিয়া টাইপ করিলেন, "বব এবং আমান্ডা চিন্তিত মুখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কখন রাস্তা পরিস্কার করার গাড়ী আসে। দেরী দেখে ঠাণ্ডায় দুজনে দুটি সিগারেট ধরায়।" ব্যস এই পর্যন্ত লিখিয়া পুনরায় ভাবিতে বসিল, কেমন করিয়া এই দুই জনের ভিতরকার প্রেম পাঠকদিগের জ্ঞাতসারে লইয়া আসা যায় ? ইহাদের কি বাল্যপ্রেম ? হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। দুইজনেই বহুকাল ধরিয়া এপাড়ার বাসিন্দা। প্রেম কি করিয়া হইল এই জটিল ধাঁধার সমাধান খুঁজিতে খুঁজিতেই ধাঁ করিয়া অপর একটি চিন্তা লেখিকার মাথায় আসিল। আচ্ছা প্রেম হইতেই হইবে এমন দিব্যি কে দিয়াছে? সম্পর্কের আরও হাজার সম্ভাবনা তো রহিয়াছে। সর্বোপরি প্রেমের গল্প লিখিতে হইবে এমন পুরানো ধাঁচের ধারণা নব্যা লেখিকার না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

বেশ, প্রেম বাদ। তবে কি ? বেশ কষিয়ে একখানি রোমহর্ষক রহস্য গল্প রান্ধিলে কেমন হয় ? বেশ ধরা যাক, এই দুই জনের মধ্যে একজন খুন হইয়া গেলেন। এইবার সারা পাড়ার সকলেই সন্দেহভাজনের তালিকায়। আর সে নিজে উত্তম পুরুষের জবানিতে সেই খুনের কিনারা কেমন করিয়া হইবে তার গল্প বলিবে। পরতের পর পরত রহস্যের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে নিজেরই কষানো প্যাঁচ নিজেই উদঘাটিত করিবে। আহা! কি উপাদেয়ই না হইবে গল্পখানি! নিজেকে বেশ মিস মার্পেল এর ভূমিকায় বসাইয়া লেখিকা ভারি তৃপ্ত হইয়া পা দুলাইতে লাগিলেন। এমতাবস্থায়, লেখিকার সঙ্গীটি সাপ্তাহিক ছুটির দিনের ঘুমের বরাদ্দ শেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে নিচে নামিয়া আসিলেন। লেখিকাকে করলা-বাঁধাকপি-ছুরি-হাতা-খুন্তি ইত্যাদি লইয়া পাকশালায় যুদ্ধের প্রস্তুতি না লইতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। উপরন্তু রবিবার সকালে ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালা পাশে এবং ল্যাপটপ কোলে করিয়া ঊর্ধ্বমুখী হইয়া জানালার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিশ্চিত করিয়া বুঝিলেন আজ বায়ু ঊর্ধ্বমুখী হইয়াছে। আজ আর চা জুটিবে না। নিজেই কিঞ্চিৎ কাষায় তরল প্রস্তুত করিয়া আনিয়া পায়ে পায়ে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়িতে সব ঠিক আছে ?" এই একটি বিষয়রহিত দুনিয়ায় এযাবৎ কালে চিন্তা করিবার বিশেষ বিষয় নাই দুইজনেরই। সুতরাং এই প্রশ্নটিই সর্বাগ্রে আসিয়া পড়ে। সেদিক সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া আসল ব্যাপার জানিতে পারিলে সঙ্গী বলেন, "এতো ভাল কথা, আমি বরং রান্না করছি তুই লেখ"। – বলিয়া সুড়ুত করিয়া একচুমুক চা খাইয়া সাপ্তাহিক গালগল্পের ঝুড়ি উপুড় করিয়া বসিলেন। লেখিকার সঙ্গীটি এমনিতে সমস্যাজনক নন, বরং মনের তরলতা থাকিলে এবং তাঁর কর্ম পদ্ধতি নজর করিলে বেশ খানিক রম্যরচনার উপাদান জোগাড় হয়। কিন্তু কথা বলিতে বসিলে দেশ কাল জ্ঞানসম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিফহাল থাকেন না। বকিয়া বকিয়া শ্রোতা সম্পূর্ণ বেদম না হওয়া পর্যন্ত তিনি অনুভব করিতেই পারেন না যে তিনি ঠিক কতখানি অত্যাচার করিতেছেন শ্রোতাদের উপর। তাঁর এই বিশেষ স্বভাবটি সম্পর্কে লেখিকা তাই প্রবলপ্রকারে সতর্ক থাকেন। এক্ষণে এই হত্যার রহস্য সন্ধানে এমনিতেই লেখিকা যে বেশ খানিক ল্যাজে-গোবরে হইবেন এ সম্পর্কে লেখিকার নিজেরও বিশেষ সন্দেহ ছিল না। তবুও সম্মানটুকু যথাসম্ভব রক্ষা করিতে তাঁকে গল্পের প্লটখানি একটু হইলেও শক্ত বাঁধুনিতে বাঁধিতে হইবে। অতএব তিনি সঙ্গীটির বাক্য-বন্যায় আগল দিতে তাঁর মনকে এদিক-ওদিক চালনা করিতে চাহিলেন। যাতে সঙ্গীটি তাঁকে এই বাতায়ন প্রান্তে কিঞ্চিৎ নির্জনতা দেন। প্রথমতঃ মনে মনে কল্পনার উদ্যাম চলনে অভ্যস্ত হইলেও লেখিকাটি মুখের চলনে বিশেষ পারদর্শী নন। সুতরাং তাঁর এই প্রচেষ্টা সঙ্গীর বাক্য স্রোতে শুষ্ক তৃণগুচ্ছসম কোথায় ভাসিয়া গেল। ঘন্টা দেড়-দুই পরে দেখা গেল, লেখিকা, জন্ম এবং কর্মসংক্রান্ত দুই দেশের সাম্প্রতিক কোভিড পরিস্থিতিতে জনগণের মূর্খতা, রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের নৈতিকতা, মহাকাশের নবতম নক্ষত্রের আবিষ্কার, চলচ্চিত্রের নুতন-পুরানো টেকনোলজির তুলনামূলক পার্থক্য, জনপ্রিয় এবং শৈল্পিক চলচ্চিত্রের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা, লনে কেন ঘাস গজাইতেছে না বা গজাইলেও কেন তেমন একটা সবুজ হইতেছে না তাহার বিশেষ কারণ ব্যাখ্যা ও

তার সম্ভাব্য সমাধান ইত্যাদি সহ জাগতিক প্রায় সমস্ত বিষয়েই জ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছেন। যে জ্ঞান তাঁর এই মুহূর্তে আরোহন না করিলেও বেশ চলিয়া যাইত। এবং হত্যারহস্য সংক্রান্ত প্লটটি এই দুইঘন্টা যাবৎ বিশ্বরূপ দর্শনের ফাঁক গলিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, সাপ্তাহিক রান্নাবান্নার কাজটি, যেটি নাকি না করিলে সারাসপ্তাহ ওই ভাতে-পোড়া অথবা দোকানের খাবার খাইয়া থাকিতে হইবে, সেটিও বাকি রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং সাপ্তাহিক ছুটির দিনের প্রায় অর্ধদিবসকাল বাতায়নপ্রান্তে কাটাইয়া লেখিকার হাতে রহিল "যাহ, রান্না করা হল না তো" – নামক একটি পেন্সিল থুড়ি চিন্তা।

প্রাথমিক হতাশা কাটাইয়া লেখিকা ভাবিলেন, ছুটির দিনে সঙ্গীর সঙ্গে গল্প করা তাঁর গার্হস্থ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। হাতে কর্তব্যকর্ম বিশেষ না থাকিলে রবিবারের চায়ের সহিত "টা" হিসেবে তিনি জগৎসংসারের যাবতীয় জ্ঞানলাভের এই পর্বটি বেশ উপভোগই করেন। সুতরাং গল্প লিখিবার সময়টি তিনি ভুল বাছিয়াছিলেন। এমত চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, বরং কাজের ফাঁকে ফাঁকে অল্প অল্প করিয়া হাতের দুরাভাষ যন্ত্রটিতেই তিনি লিখিবেন। ভাবনা-চিন্তার কাজটি বরং কোশ-কলা, ইদুর-বাঁদর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতেই সারিয়া রাখিবেন। রবিবারের সকালের জন্য ফেলিয়া রাখিবেন না। মাল্টিটাস্কিং-এর চূড়ান্ত একটি নমুনা রাখিয়া যাইবেন। মনে মনে দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া তিনি একসপ্তাহব্যাপী অপরাপর কাজের ফাঁকে হস্তধৃত দুরাভাষটির উপর মনোনিবেশ করিলেন। গল্পের প্লট ততদিনে পাশ্চাত্যের হত্যারহস্য হইতে প্রাচ্যের গ্রাম্যজীবনের ওঠাপড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লেখিকা ভাবিয়া বাহির করিয়াছেন, যাহা তিনি জানেন না তাহাকে ঘষিয়া মাজিয়া অন্তত একটি চলনসই রহস্যগল্পে পরিণত করিতে তাহাঁর কালঘাম ছুটিয়া যাইবে। তাহার চাইতে যাহা তিনি জানেন, তাহাকে খানিক গল্পের রূপদান করা সহজ হইবে। এক্ষণে আরও একটি কথা তাহাঁর মনে রহিল না যে, মহাপুরুষেরা কালে কালে বলিয়া গিয়াছেন যে, সহজ পথে কোনোরূপ মহান কর্ম এযাবৎ কাল পর্যন্ত হইয়া উঠে নাই। কালঘাম না ছুটাইলে মোটামুটিরকম কিছুও হওয়া দুষ্কর। অতএব, একসপ্তাহকালব্যাপী সময় সময় দুরাভাষ যন্ত্রের পর্দায় চোখ রাখিয়া তিনি প্রবল বেগে টাইপ করিয়া চলিলেও, তার ফলাফল বিশেষ লাভজনক হইল না। তিনি লিখিলেন – "সক্কালবেলাতেই পেট খালি করে এসে মনটা উড়ু উড়ু হয়ে গেছে আজ বিষ্টুবাবুর। নিমডালের দাঁতনটা উপরের পাটির ডানদিকঘেঁষে ঘষতে ঘষতে উঠোনের কুমড়ো গাছটাকে দেখছিলেন অনিয়মতলা বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার বিষ্টুবাবু। কুমড়োলতা একবার ঠিকঠাক লেগে গেলে এমন তরতরিয়ে বাড়ে যে তাকে কাঠি দিতে দিতেই সময় যায়। অবশ্য এরকম কাঠি দিতে তাঁর বরং ভালই লাগে। এই কাঠি বেয়ে ওপরে ওঠা যায়। অন্যরকম কাঠিটা আবার বিষ্টুবাবুর চলে না। খেয়ে যান যদিও মাঝে মধ্যেই। বুঝতে পেরেও শেষপর্যন্ত সামলাতে পারেন না। এই যে পাশের বাড়ির পরেশ জোয়ারদার বাঁশ-কাঠের জোরদার ব্যবসা করে তিনতলা হাঁকিয়েছে। জোয়ারদারের ক্লাস সেভেন ফেল মেজছেলেটা সেদিন বিষ্টুবাবুর গুড়েপুকুরের দক্ষিণপারের বাঁশঝাড় থেকে তিন-তিনটে সপাট বাঁশ দিনদুপুরবেলা কেটে নিয়ে গেল সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সে কি বিষ্টুবাবু দেখেননি ! না কি কিছু বলবেন না বলে বলেননি ! একে তো ওই গুটখাখোর একগাল লালা নিয়ে কি বলে অর্ধেক কথা তিনি বুঝতেই পারেন না। তারপর কথা বলতে গেলেই জলপ্রপাতের মতো থুতু ছেটায় হতভাগা। এসব অবশ্য অনুষঙ্গ। তাকে ঘাঁটাতে না চাওয়ার আসল কারণটা হল, সে ব্যাটা গোঁফ না গজাতেই পার্টি করছে। তাইতেই তার আসল রোয়াব। নইলে এই সেদিন পর্যন্ত বিষ্টুবাবুকে "মাস্টামশাই" বলে সম্বোধন করত পরেশ জোয়ারদার। আজকাল আড়ালে যে তাঁকে "বিষ্টুমাষ্টার" বলে ডাকে সে খবর বিষ্টুবাবুর কানে এসেছে। যাক গে যাক, তিনটে বাঁশের জন্যে ওই পার্টির গরমওয়ালা থুতুসমুদ্রে নাইবার ইচ্ছে নেই বিষ্টুবাবুর।" ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় তিন পৃষ্ঠা হাবিজাবি। কিন্তু ক্রমশই সে গল্প বিখ্যাত এক লেখকের অনুকরণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভাব, ভাষা সকলই চেনা চেনা ঠেকিতে লাগিল। মৌলিক গল্প লিখিয়া বিখ্যাত হইতে গিয়া শেষে গল্পতস্কর বলিয়া কুখ্যাতি না হয় ! একসপ্তাহ যুদ্ধ করিয়া লেখিকার মনে হইতে লাগিল – নাহ, এ যাত্রাও হইল না বোধহয়। এমন টুকলিমার্কা গল্প না লেখাই বাঞ্ছনীয়। হতদ্যম হইলেও মনে মনে পুরোপুরি হার মানিয়া লইতে কিঞ্চিৎ অসুবিধা তখনও রহিয়া গিয়াছিল।

শেষপর্যন্ত, পুরোনো পাপের জেরে লেখিকাকে যখন একদিন এবং তাহারপর একাদিক্রমে আরও বেশ কয়েকদিন পরপর দন্তচিকিৎসকের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইল, তখন ব্যাপার কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হইলো লেখিকার কাছে। গল্প লেখার বায়ুটি শেষপর্যন্ত গত হইল। ব্যাপারটি খুলিয়াই বলা যাক। একখানি আধখাওয়া দাঁত কয়েকবছর ধরিয়াই ধীরে ধীরে শিষ্ট হইতে দুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। লেখিকার মুখগহ্বরের একপ্রান্তে বসিয়া কারণে অকারণে নিজের উপস্থিতি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সতর্কতা জারি করিয়া মজা দেখিত। তাহাকে জব্দ করিবার নিমিত্ত দাঁতের মালকিন ছোটখাটো বহু উপাচারের আয়োজন করিলেও শেষ অবধি উৎপাতটিকে বাগে আনিতে অক্ষম হন এবং এইবার ইহাকে সমূল উৎপাটন না করিলেই নয় এই মর্মে নির্ণয় লন। সেইমত, একদিন এক দন্ত বিপণীতে পৌঁছাইলে দন্তচিকিৎসক বলিলেন, সেই দুষ্ট দাঁতের ব্যবস্থা তো তিনি করবেনই, সঙ্গে মুখগহ্বরের সেদিকপানেরই আরও একখানি দাঁত, যে দুষ্ট-সংসর্গে বেপথে চলিবার নির্ণয় লইয়াছে, তার দেহের একখানি বড়সড় গর্তও বুজাইয়া দিবেন। ইহাতে লেখিকার আহ্লাদ বৈ বিমর্ষতা জন্মিল না। কারণ শীতল কিছুতে এই দুই নম্বর দাঁতটির বিশেষ বীতরাগ, বেজায় অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিতেছিল। ফুরফুরে মনে লেখিকা তো হাঁ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং চিকিৎসক তার সহকারিণীটিকে লইয়া লেখিকার মুখের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। পটাপট সূচ ফুটাইয়া, লেখিকার মুখের অর্ধখানিক অবশ করিয়া, ছেনি-বাটালি ঠুকিয়া, শিরীষ কাগজ দিয়া ঘসিয়া, গর্তে মাটি ঠুসিয়া, গর্তের মুখ সিমেন্ট ঢালিয়া প্রথমেই দ্বিতীয় দাঁতটির বেশ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সমস্যা হইল দুষ্ট আপদটিকে লইয়া। বাহিরের অংশ ভাঙ্গা বলিয়া তাহাকে বেশ জব্দ করিয়া ধরা কঠিন। বেশ খানিক ভদ্র উপায়ে চেষ্টা করিয়া দুই দন্তবিশারদ ক্ষান্ত দিলেন এবং সম্পূর্ণ মজুর সুলভ উপায়ে ঠুকিয়া-ঘষিয়া-খুঁচাইয়া যখন অবশেষে দাঁতটি যখন উৎপাটন করা গেল ততক্ষণে রোগী, চিকিৎসক এবং সহকারিণী সকলেই গলদঘর্ম হইয়াছেন। ঘাম মুছিয়া ডাক্তার বলিলেন ইহা ইহা করিবেন, ইহা ইহা করিবেন না। ইহা ইহা হইলে তৎক্ষণাৎ জানাইবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। গালে হাত দিয়া মুখের ঝোল সামলাইতে সামলাইতে রোগী বলিবার চেষ্টা করিলেন "হ্যাঁ হ্যাঁ"। অর্ধঅবশ বাঁকা জিহ্বা, নাল-ঝোল-তুলো-গজ-অর্ধঘটিকার যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া বলিল "অ্যাঁ অ্যাঁ"। মুখ হইতে টপ করিয়া খানিক লালা বাহির হইয়া লেখিকার শ্রদ্ধেয়, ভাবগম্ভীর অবয়বটিকে বেমালুম মাটি করিয়া তাঁহার জামায় আসিয়া পড়িল। ডাক্তারের মুখে যে যাইয়া পড়ে নাই এই ভাগ্য মনে করিয়া লেখিকা তড়বড় করিয়া মুখ মুছিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। গল্প এখানে শেষ হইলে গল্প লেখার গল্পে এগল্পের ঠাঁই হইত না। বাকিটুকু নিম্নরূপ।

দন্তচিকিৎসকের কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখের দপ্তরে যন্ত্রণা ভোগের এবং যন্ত্রণা মুক্তির মূল্য চুকাইতে যাইলেন। সেখান হইতে সংবাদ পাইলেন যে তাঁকে ফের আর একবার আসিতে হইবে কারণ এই দুষ্ট দাঁতটুকু উৎপাটন করিলেই তো হইবে না, মুখ গহ্বরের বাকি অংশের পরীক্ষা এবং তৎপরবর্তী করণীয় যা কিছু সেসব না করিলে তাঁর মুক্তি নাই। নিমরাজি হইয়া লেখিকা সেদিন তো ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু অচিরেই বুঝিলেন যে পরবর্তী অংশে তাঁর মতামত বিশেষ গ্রাহ্য হইবে না। নিজের মুখগহ্বরের ভিতরের বেশ কিছু অংশ মেরামতি ও চাকচিক্য বৃদ্ধি করবার অনুমতি পাইয়া পরবর্তী পাঁচ দিনে দন্তবিদ এবং তাঁর আজ্ঞাবহ সহকারিনী দাঁতের পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে লেখিকার লেখিকাসুলভ সমস্ত ধার-ভার-গাম্ভীর্য-নিজের মহৎ লেখনীর গর্ব- অর্থাৎ কালজয়ী হইয়া উঠিবার সমস্ত পারিপার্শ্বিক জঞ্জাল সাফ করিয়া দিলেন। বিনা দয়া মায়ায় দন্তবিদ তাঁর যন্ত্রপাতি লইয়া লেখিকার অজেয় গল্পলেখার আকাঙ্খার মূলে আঘাত করিতে লাগিলেন। চক্ষুমুদিয়া, দাঁত খিঁচাইয়া, দন্তবিদের হাতে মুখগহ্বর সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া লেখিকা ক্রমশই লেখিকা হইতে অসুস্থ দাঁতওয়ালা রোগীমাত্রে পরিণত হইতে লাগিলেন। প্রথম দিবসের আত্মসচেতন, দার্শনিকসুলভ নাকউঁচু লেখিকা উখা-বাটালি-হাতুড়ির ঘায়ে ধীরে ধীরে সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি হইয়া উঠিলেন। স্ব-ইচ্ছায় যাঁর মাথাটি ঘুরাইবারও অনুমতি নাই। ঘুরাইবার উপক্রম করিলেই দন্তবিদের হাত তাঁকে প্রতিহত করে। অগত্যা লেখিকা অসহায় হইয়া, মুখে তিন-চার রকমের নল ও যন্ত্রপাতি গুঁজিয়া, সিলিং এর নকশা দেখিতে লাগিলেন, এবং মাথার কাছে কর্মরত দন্তবিদের পেটের ভিতর হইতে নানান রকমের কেঁউ-কৌ শব্দ শুনিতে শুনিতে মনে মনে আপন আশৈশবের মৃত্তিকা নির্মিত গৃহের সিলিং এর সহিত তার তুলনা করিতে লাগিলেন। এ যেন পার্সোন্যালিটিহীন নির্গুণ ব্রহ্ম দশা। ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, যন্ত্রণাবোধ নাই। যেন অন্যের শরীরে হাতুড়ি ঠুকিবার পরোক্ষ অভিজ্ঞতা! শরীর, মন, উদ্বেগ, গর্ব হীন সচ্চিদানন্দ আত্মা যেন ! আহা !

ক্রমান্বয়ে চতুর্থ দিবস এই যন্ত্রণার শেষে লেখিকা দেখিলেন, তিনটি দাঁতের সাথে সাথে তাঁর অজেয় কথা সাহিত্যিক হইবার সমস্ত বায়ু অস্তমিত হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, তিনি নতুন করিয়া কিছু সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত তাঁর জন্ম হয় নাই। তিনি কেবল মহাকালের (আপনি এক্ষেত্রে দন্তবিদও পড়িতে পারেন) পরীক্ষার পাত্রী বৈ কিছুই নন। নড়া-চড়া, যন্ত্রণার অনুভূতি সকলই আপেক্ষিক, অন্যের হস্তে অর্পিত। পাঠকের কাছে "দেখ, কেমন গল্প বানাইতে পারি !" বলিয়া কলার তুলিবার সমস্ত অপ্রয়োজনীয় দুষ্ট-মায়া দুষ্ট দাঁতের সাথে সাথেই অন্তর্হিত হইয়াছে। পাঠককুলের উচ্চপ্রশংসা লাভের বিকট দুরাশা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া মন শান্ত হইয়াছে। গল্প না লিখিতে পারিবার তীব্র উদ্বেগ প্রশমিত হইয়া নিজ অবস্থা সম্পর্কে মনে দিব্য এক কৌতূক জন্মিতেছে। ইহাকেই বোধকরি তূরীয় অবস্থা বলিয়া প্রাজ্ঞরা বর্ণনা করিয়াছেন। যশাকাঙ্ক্ষী লেখিকাকে পারিপার্শ্বিক ভাল মন্দ সমস্ত কিছুতেই আর বিশেষ উদ্বিগ্ন হইতে দেখা যাইতেছে না, বরং তৎপরবর্তী সময় হইতেই লেখিকা সাহিত্যসৃষ্টির বাতুলতা না করিয়া কেবল জীবনচক্রে চলিবার রোজনামচাটুকুই লিখিবার আয়োজন রাখিবে স্থির করিয়াছে। শরীরের যন্ত্রণা ভুলিতে জগৎসংসারের নিয়ত বয়ে চলা নাটকের দর্শকমাত্র হইয়া অক্ষরগর্বে গর্বী লেখিকার গল্প লিখিবার গল্পটি চিরতরে সমাধিস্ত হইয়াছে। তৎস্থানে, তিনটি দাঁত বিসর্জন দিয়া দিব্য এক জীবনসংকলকের উৎপত্তি হইতেছে বলিয়াই মনে হইতেছে।

সুতরাং, এই একখানি উৎকট গল্পের কমতিতে ভালই থাকিবেন এমন আশা করিতে বাধা নাই। গল্প আপাতত এপর্যন্তই। ইহার অধিক আর কি !

অলিমিতি।

এক অর্বাচীন জীবনসংগ্রাহক।

Arpita Chatterjee — Postdoctoral Research Associate, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE-68198.

ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়

কয়েকটি শেষ না হওয়া ভূতের গল্প

পর্ব ১

সেদিন খুব বর্ষা, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। মাঝে মাঝে জমাট বাঁধা কালো মেঘের ফাঁকে বিদ্যুৎ উঁকি দিয়ে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছে। সেই অবসরে গরম চায়ের কাপে হঠাৎ একরাশ কথা কোথা থেকে উড়ে এলো। সদ্য ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাওয়া মেয়ে আর আমি। প্রসঙ্গের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়ার আগেই এলো ভারতবর্ষের কথা এবং ওখানকার মানুষজন ও সংস্কৃতি। আমার ছোট্ট জ্ঞানের ঝুলি যতটা সম্ভব টেনে-টুনে চালাতে লাগলাম। বর্ষার বেগ ক্রমশ বাড়ছে, এখন কোথায় জমাটি ভূতের গল্প হবে না এইসব খটখটে ব্যাপার। কথায় কথা বেড়ে শেষে ধর্ম ও ধার্মিক এবং নাস্তিকের ভিতর ঢুকে পড়লাম আমরা। বরাবরই নতুন যুগের ছেলেমেয়েরা খুব প্রশ্নবিলাসী হয়; সেইসব উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দায়িত্ব পড়ে বাবা-মায়ের উপর। যদি উত্তর জানা না থাকে তবে ঠেকনা দিয়ে বা কথা ঘুরিয়ে যতক্ষণ চালানো যায় আরকি।

যথারীতি ঈশ্বর, বিশ্বাস, মূর্তি-পূজা, মূর্তি ছাড়া পূজা, অনেক ঈশ্বর, একটি-ঈশ্বর এইরকম হাজারো জিনিস উড়ে এসে দিল বর্ষার একটি বেলা একদম মাটি করে। এক্ষণে সেই কথোপকথনের কিছু লিপিবদ্ধ করলাম –

মেয়ে : আচ্ছা ভারতের সবাই কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ?

আমি : সবাই কিনা বলতে পারবো না, তবে আমার মনে হয় বেশিরভাগ ভারতীয় ঈশ্বর বিশ্বাসী ?

মেয়ে : আহা, ওভাবে বললে হয়না। তুমি কি কোনো সংখ্যা দিয়ে বোঝাতে পারবে? মানে ১৪০ কোটির দেশে ঠিক কতজন ঈশ্বর মেনে চলে?

আমি : কার মনের ভিতর ঈশ্বর লুকিয়ে আছে, আর কে ঈশ্বরকে রাস্তায় নিয়ে ঘোরে, কি করে বলি বলতো ? স্বয়ং ঈশ্বর এলেও তো মুস্কিলে পড়ে যাবে। তবে, হবে হয়তো ১৩৫ কোটি। বাকি ৫ কোটি মাতাল।

মেয়ে : এতো লোক ঈশ্বরকে মানে ? এরা সবাই বিশ্বাস করে ঈশ্বর ওদের পরিত্রাতা ?

আমি : করে বৈকি। যখন হাতের কাছে কিছুই পায় না তখন ভগবানই অগতির গতি ?

মেয়ে: এরা কি সবাই একটাই ঈশ্বর মানে ? নাকি অনেক ঈশ্বর আছে ?

আমি : ওখানে একটু মুশকিল আছে। একটা মাত্র ঈশ্বর হলে পুরো ব্যাপারটাই ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাবে। কি রকম একটা সাদাকালো সিনেমার মতো। তবে ধর্ম অনেক, আর তাদের বিভিন্ন মত। কেউ একটা ভগবানেই খুশি আবার কেউ অনেক চায়।

মেয়ে: আচ্ছা এই ধর্মটা কিভাবে ঠিক হয় ? মানে জন্মের পর থেকেই ঠিক হয়, না পড়াশুনা করে প্রাপ্তবয়স্ক হলে যে যার মতো করে একটি বা বহু ধর্ম বেছে নেয় ?

আমি : না রে, বেছে নেওয়ার উপায় একদমই নেই। ভারতীয়রা জন্মগত ধার্মিক। আর একজনের পক্ষে একটা ধর্মই যথেষ্ট। বেশি নিয়ে শেষে নাকানি-চোবানি অবস্থা হবে।

মেয়ে : কেন ? একের বেশি নেওয়া যাবে না কেন?

আমি : ধর্মে-ধর্মে ঠোকাঠুকি। তেলে জলে কি মিশ খায় ?

মেয়ে : তাহলে প্রত্যেক ধর্ম একদম আলাদা এবং একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে না। আচ্ছা জন্মেই কি করে ধার্মিক হয়ে যায় ?

আমি : আলাদা কি করে হয় তা তো বলতে পারবো না। তবে দেখে তো আলাদাই মনে হয়। মানুষ তো মিলেমিশে থাকতেই ভালোবাসে, কিন্তু ধর্ম ঢুকলেই আবার তেল-জল। ভারতবাসীরা সবাই ধার্মিক রে। ওদের শরীরের প্রত্যেকটা অনু-পরমাণুতে ধর্মের বাস। তাই ভবিষ্যতে যে জন্মাবে সেও ধার্মিক।

মেয়ে : মানে ওদের নিজস্ব কোনো অধিকার নেই ? তুমি কি বলছো ওরা সবাই 'জিন'গত ভাবে ধার্মিক ?

আমি : হ্যাঁ।

মেয়ে: এতো দারুন ব্যাপার। একটা দেশের প্রায় সমস্ত মানুষ ধর্মের পথে চলে। সে তো সোনার দেশ গো ?

আমি : সোনা কিনা তা তো বলতে পারবো না।

মেয়ে : তাহলে ওরা কেউ মিথ্যে বলে না ? দুঃস্থের সেবা করে ? কাউকে ঘুষ দেয়না ? খুন-খারাপি করেনা ? মুখে এক ভিতরে এক নেই ? একে অপরকে হিংসা করে না ? এরকম দেশে থাকতে পারাও তো খুব সৌভাগ্যের !

আমি : এতো মহা মুস্কিলে ফেললি।

মেয়ে : কেন ? ধর্মের পথ মানেই তো সত্যের পথ।

আমি : আহা, সে তো একশোবার ঠিক। কিন্তু মানুষ যে ধর্মকে তার নিজের মতো করে নেয়। তাই ওখানে ধার্মিক হলেও মিথ্যা বলা যায়, হিংসা করা যায়, আরো হাজার রকমের কূ-কাজ করলেও ধার্মিক।

মেয়ে : এ কিরকম হলো ? তাহলে তো নাস্তিক আর ধার্মিক ফারাক করাই যাবেনা। নাস্তিকরা তবু সরাসরি স্বীকার করে নেয় যে তারা ওসব দেব-দেবী মানে না। কিন্তু ধার্মিকরা যদি নিজেদের সুবিধা মতো ধর্মকে বাঁকিয়ে নেয়, তাহলে তো তারা নাস্তিকের চেয়েও বড় নাস্তিক।

আমি : ওসব ঈশ্বর বিচার করবেন। আমাদের বেশি ভেবে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং একটা ভূতের গল্প শোন।

(চলবে)

ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় – নিজের ব্যাপারে লেখার মতো কিছুই খুঁজে পেলাম না। ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামে আর বুড়োবেলা কাটছে বিদেশের মাটিতে। কথায় কথায় বেলা বয়ে সামাজিক জটলায় নিজেকে বেশ আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে ফেলেছি। এখন অবসরের অছিলায় 'আমি' নামক বস্তুটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

স্বর্ণালী সাহা

কলকাতায় মহাবিশ্ব মহাকাশ: এম.পি.বিড়লা তারামণ্ডলে

আকাশ ভরা সূর্যতারা, কলকাতার এম.পি.বিড়লা তারামণ্ডলে । তারামণ্ডল, যাকে বলা যায় নকল আকাশ, অতীতে ছিল কাঠের গ্লোবের মতো দেখতে, যা জার্মানি, ব্রিটেন ও রাশিয়াতে প্রিয় ছিল । ১৯৫৬-১৯৬০ এর মধ্যে জার্মানিতে তারামণ্ডলে প্রক্ষিপ্ত ছবি দেখানো শুরু হয় । কলকাতার মানুষ শীতের মরশুমে তারামণ্ডলে ভিড় জমাবেই । কমনওয়েলথ এর দেশগুলির মধ্যে লন্ডনের পরে কলকাতা তারামণ্ডল দ্বিতীয় । এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম ।

বর্তমানের তারামণ্ডল গড়ে ওঠার স্থানটি সেনাবাহিনীর হাতে ছিল । পরে উদ্যোগপতি শ্রী এম.পি.বিড়লা লীজ-এ পান । পাঁচ থেকে সাত বছর পরিকল্পনার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর যৌথ প্রয়াসে সাঁচী স্তুপের ধরণে কলকাতায় তারামণ্ডলটি গড়ে ওঠে। এই গোলাকৃতি তারামণ্ডল এম.পি.বিড়লা প্লানেটেরিয়াম নামে খ্যাত ।

১৯৬৩ সালের ২ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কলকাতা তারামণ্ডলটি উদ্বোধন করেন। ওই দিনটি থেকে এখনো পর্যন্ত প্রায় ২.৫ কোটি দর্শক তারামণ্ডলে বসে মহাকাশ মহাবিশ্বের কথা জানতে পেরেছেন এবং বিশ্বমন্ডলে কি ঘটছে তার প্রক্ষেপন দেখেছেন ।

এম.পি.বিড়লা তারামণ্ডলে যান্ত্রিক প্রজেক্টরের তথা আলো-বিকিরণ যন্ত্রের (ষ্টার বল) সাহায্যে নক্ষত্রপুঞ্জের নীহারিকা, ছায়াপথ গোম্বুজাকৃতি অংশে প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের সামনে আসে। জার্মানির কার্ল জাইস লেন্সের মাধ্যমে মহাকাশ ধরা দেয়। ২০১৭ সাল থেকে আরোও উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন ডিজিটাল লেন্সের সাহায্যে প্রতি শো-তে ৫৭৭ জন দর্শক একসঙ্গে এই মহাকাশ প্রক্ষেপন দেখেন ।

মহাকাশের সৌরমণ্ডল, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, আকাশগঙ্গা, ১০,০০০ কোটি নক্ষত্র চলতে চলতে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায়। এই সংঘর্ষের চিত্র তারামণ্ডলে প্রজেক্টর মেশিনের সাহায্যে দেখানো হয়। আবার, গ্রীক পুরানের ৪৪ টি নকশার কাল্পনিক চিত্রের সাথে তারামণ্ডলে কালপুরুষ ও সপ্তর্ষি মণ্ডলকেও তুলে ধরা হয়েছে ।

মহাজাগতিক সংঘর্ষে নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভয় পেতেন। বরফ আর পাথরের চাঁই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ধুলো আর বাষ্পের লেজে পরিণত হয়ে তৈরী হয়েছে ধূমকেতু। এই সবই তারামণ্ডলে দৃশ্যমান ।

সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জই পরিবর্তনশীল। চাঁদের জন্ম কিভাবে হলো, তারও প্রক্ষেপণ তারামণ্ডলে এলে দেখতে পাওয়া যায়। সৃষ্টির আদিকালে সৌরজগতে ভেসে বেড়াতো অসংখ্য পাথর। পৃথিবীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষে কিছু পাথর ফিরে আসে আর বাকিরা মহাজগতে থেকে যায়। এর ফলে জন্ম নিয়েছিল চাঁদ। রাতের আকাশে সূর্যের শক্তি রূপান্তরিত হয় আলো আর শক্তিতে। সৌরঝড়, সৌরমন্ডলে চলতে থাকে। অপরূপ আলোর সৃষ্টি হয়, সংঘর্ষের ফলেই। তাতেই জীব বিবর্তনের গতিপথ বদলে গিয়েছিলো ।

ছয় কোটি বছর আগে গ্রহাণু ৬৫,০০০ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে এসেছিলো আর সেইসময় মেক্সিকোর কাছে ছিল ডাইনোসরদের বিচরণভূমি, ছয় মাস অন্ধকারে অতিবাহিত করতে হত তখন। গ্রহাণুদের সংঘর্ষ হওয়ার ফলেই মানুষ পৃথিবীতে হাঁটতে পেরেছিলো। গ্রহদের গতিপথ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। এইসমস্ত বিষয়েই আমরা সমৃদ্ধ হতে পারি তারামণ্ডলে দর্শকাশীন হলে।

চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখা যায় এবং তা দেখতে কেমন লাগে ? এম.পি.বিড়লা তারামণ্ডলে এলেই তা দেখা যাবে। পৃথিবী থেকেও তো চাঁদ দেখিয়ে মায়েরা গল্প বলেন শিশুদের। চাঁদ থেকে পৃথিবীকে ধূলোকনার মতো লাগে। তারামণ্ডলে

আছে কিছু গ্যালারি যার একটিতে আছে ওজনযন্ত্র। পৃথিবীতে একটি মানুষের ওজন কত হবে, অন্যান্য গ্রহেই বা তাঁর ওজন কত হবে তার একটি উপস্থাপনা আছে। চাঁদের মাটির চেহারাও দেখার মতো। আছে মহাকাশ সম্বন্ধীয় গ্যালারি, যেখানে আছে নানা গ্রহের আলোক সম্বন্ধীয় অঙ্কনচিত্র এবং মহাকাশচারীদের মডেল ।

প্রতিদিন তারামণ্ডলে তিনটি করে ৩০ মিনিটের ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দি ভাষাতে শো দেখানো হয়। শীতের সময় বিশেষ কুপনের ব্যবস্থাও আছে এই তারামণ্ডলে শো দেখার জন্য। কলকাতার তারামণ্ডলটি দ্বিমাত্রিক (২ডি)। কলকাতার যমজ শহর হাওড়াতেও ত্রিমাত্রিক (৩ডি) তারামণ্ডল ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে দর্শকদের জন্য ডিসেম্বর ২০২২ থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে । এই তারামণ্ডলটি ৩৬০ ডিগ্রিতে সৌরজগতের আকাশগঙ্গা থেকে শুরু করে নানান নক্ষত্রের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেয় । ২৫ মিনিট ধরে এই শো দেখানো হয় ।

এই রাজ্যে প্রথম ত্রিমাত্রিক (৩ডি) তারামণ্ডলটি হাওড়ার শরৎসদন চত্বরে তৈরী হয়েছে । কলকাতার তারামণ্ডলের মতোই এখানেও লেজার শো-এর মাধ্যমে মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ দেখতে ও তাদের সম্পর্কে জানতে পারবেন দর্শকেরা ।

এম.পি.বিড়লা তারামণ্ডলে শো দেখার পর প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে দেখি ছোট্ট তিতাস অবাক । মহাকাশ, মহাবিশ্বকে দেখে তার প্রশ্নের শেষ নেই ।

এম পি বিড়লা তারামণ্ডলের গ্যালারিতে সৌরামণ্ডলের ছবি দেখা যায়।

এম পি বিড়লা তারামণ্ডলের ভিতরে।

Swarnali Saha completed her Master's in Journalism & Mass Communication at Visva-Bharati with a First Class and thereafter had stints with important print & electronic media houses. Now, she pursues the career of an educator and spends her free time in chronicling life in Kolkata through the prism of her mind's eye.

সন্দীপ ভট্টাচার্যী

তাওয়াঙ ভ্রমণ

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো ভালুকপঙ পৌঁছতে, অসম-অরুণাচলের এই সীমান্ত শহরটা বেশ মনোমুগ্ধকর, যেদিকেই চোখ যায় শুধু সবুজ পাহাড়, কামেং নদী কল-কল শব্দে ভালুকপঙকে পাশে রেখে কোথায় যে হারিয়ে গেছে কে জানে! আকাশটা বেশ মেঘলা, জমিয়ে শীত পড়েছে, বাহান্ন কিলোমিটার দূরে আসার সময় তেজপুরে শীত এতটা মনে হয়নি, তবে ডিসেম্বর তো প্রায় শেষ হতে চললো, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এখন তো শীতের জাঁকিয়ে বসারই কথা. আজ রাতটা এখানে বিশ্রাম নিয়ে কাল সন্ধ্যায় আমরা অরুণাচল প্রদেশের দীরাং পৌঁছাবো, তবে অবশ্যই বোমডিলা ভালো করে ঘুরে । আমরা যে লজটাতে উঠেছি সেটা ছোট হলেও স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো অভাব আছে বলে মনে হলো না, তবে দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে থাকার ফলে অভ্যেসটা যে খারাপ হয়ে গেছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, ভারতবর্ষের মাঝারি মানের এই সমস্ত লজ, হোটেলস, গেস্ট হাউসের স্বাচ্ছন্দ্যের আর পরিচ্ছন্নতার মানের ব্যাপারে আমাদের কোনো অভিযোগ-অনুযোগ থাকবে না, এটা ভাবা ঠিক হবে না । রঘু আমাদের ড্রাইভার, প্রায় তিনদিন হতে চললো, আমাদের সাথে অধিকাংশ সময় থাকা সত্বেও ওকে আমরা বলিনি আমরা সিডনী থাকি, এখনো অবধি ও জানে যে আমরা কলকাতায় থাকি ।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে আমি দারুণ ভালোবাসি, এখানকার জনজাতিগোষ্ঠিদের ব্যাপারে, এখানকার ভৌগলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সেই কৈশোর থেকে আমার অদম্য উৎসাহ, আজও তাতে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি । রঘুর সাথে এই কয়েকদিন গাড়িতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যাপারে আমাদের প্রচুর আলোচনা হয়েছে, ওর কাছ থেকেই বিশদ জানতে পেরেছি যে আমাদের যাত্রাপথের বেশ কিছুটা বেশ বিপদসঙ্কুল, বিশেষ করে অসম-অরুণাচল

সীমান্তের বিস্তীর্ণ তরাই অঞ্চল, যেখানে বোরো বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জঙ্গীহানা এবং কিডন্যাপিং অব্যাহত রেখেছে। রঘুকেও সম্পূর্ণরূপে প্রথমেই বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছিলো, একদা অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আসু) এর সক্রিয় কর্মী বছর তিরিশের রঘু এখন পুরোপুরিভাবে সংসারী, ও অসমীয়া, বিয়ে করেছে বঙ্গতনয়াকে, ওদের একটা বছর পাঁচেকের মিষ্টি মেয়েও আছে, আমাদের ভ্রমণের শেষ পর্বে অসম রাজ্যে ওর এক চিলতে ঘরে ওর সুখী পরিবারে কিছুটা সময় অতিবাহিত করে খুব ভালো লেগেছিলো, নিঃসন্দেহে ওদের আন্তরিকতা আর আতিথেয়তা আমাদের মুগ্ধ করেছিলো। যাত্রার প্রথমদিকে রঘুকে আমরা যে অস্ট্রেলিয়াতে থাকি, সেটা চেপে যাবার অনেক কারণ ছিলো, তবে মুখ্য কারণ ছিলো কিডন্যাপিং এর ভয়, অন্য গুলো সব গৌণ ।

ভালুকপঙ-এ অনেক বাঙালি পর্যটক দেখে অবাক হলাম না, আগেই শুনেছিলাম ভ্রমণপিপাসু, এডভেঞ্চারপ্রিয় বাঙালি অরুণাচল প্রদেশের এই তাওয়াঙ সেক্টরটা খুব পছন্দ করে। বেশ রাত হয়েছে এখন, একটা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে, জানি না কি ফুল, ছল-ছল শব্দে নদী বয়ে চলেছে দূরে। ভালুকপঙ-এ এখন নিবিড় অন্ধকার, হঠাৎ সময় যেন থেমে গেছে, মনে হচ্ছে অনেক অনেক দূরে কোনো দুর্গম প্রান্তিক জায়গাতে পৌঁছে গেছি, ঘুমানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না, বুঝতে পারছি উত্তেজনার আঁচ পোয়াতে শুরু করেছি, মংপা উপজাতি, জিও-পলিটিকাল এডভেঞ্চার, ভয়ংকর বিপদসঙ্কুল সেলা পাস, রহস্যময়ী তাওয়াঙ সব যেন হাতছানি দিচ্ছে ।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, চোখ রগড়াতে-রগড়াতে বাইরের বারান্দাটাতে চলে এলাম, দেখলাম আমার চতুর্দিকে ঘন সবুজ জঙ্গল এ ঢাকা পর্বতশ্রেণী রৌদ্রস্নাত হতে শুরু করেছে, বুঝলাম আর দেরী করা ঠিক হবে না, আমাদের তাড়াতাড়ি তৈরি হতে হবে, সন্ধ্যার আগেই দীরাং পৌছতে হবে, নাহলে সমূহ বিপদ, অন্ধকারে এই দুর্গম খাড়াই সঙ্কীর্ণ বিপদসঙ্কুল পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানো যে আত্মহত্যারই সামিল সেটা কয়েকবছর আগে উত্তর সিকিমের লাচুং যাবার সময় বেশ হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলাম. যাই হোক বেশ দ্রুততার সাথেই আমরা সবাই স্নান ও প্রাতকৃত্য সম্পন্ন করে প্রাতরাশ করতে লজ সংলগ্ন গাছবাড়ি রেঁস্তরাতে গেলাম, বেশ উঁচু রেঁস্তরার থেকে ভালুকপঙকে অসামান্য লাগছে, একদিকে অসম আর একদিকে অরুণাচল, নীচে স্বচ্ছ নদী, পরিস্কার আকাশটাকে দেখে মনটাও উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। হঠাৎ মনে পড়ল আমাদের "প্রোটেক্টেড এরিয়া পার্মিট" দেখাতে হবে অরুণাচল প্রদেশে প্রবেশের সময়, আমাদের অস্ট্রেলিয়ান পাসপোর্ট থাকার জন্য এটা দরকার ছিলো, ভারতীয় পর্যটকদের জন্য "ইনার লাইন পার্মিট" লাগে। পার্মিটগুলো হাতের কাছে রেখে দিয়ে জমিয়ে প্রাতরাশ করে আর গরম-গরম চায়ে তৃপ্তির চুমুক দিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলাম, আমাদের অরুণাচল সফর শুরু হলো অরুণোদয়ের কিছুক্ষণ পরেই ।

অসম-অরুণাচলের সীমান্তে দেখলাম ভারতীয় প্যারা-মিলিটারির প্রহরারত জওয়ানরা প্রায় সকলকেই আগাপাশতলা নিরীক্ষণ করছে। প্রথমে ভাবলাম এই প্রহরা তাওয়াঙ এর মতো ভারত-চীন সীমান্তের একটা স্পর্শকাতর অঞ্চলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য। রঘু বললো অন্য কথা, বোরো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জঙ্গীহানা আর কিডন্যাপিং জন্য এই অঞ্চলটা একটা উপদ্রুত অঞ্চল, ভারতীয় জওয়ানরা প্রায়ই সংঘর্ষে লিপ্ত হয় বোরো জঙ্গীদের দমনের জন্য, রঘু ঠিক বলেছিলো, দেখলাম বেশ কয়েকটা সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে প্যারা-মিলিটারির জওয়ানরা রাস্তায় টহল দিচ্ছে, আর সন্দেহ রইলো না যে আমরা উপদ্রুত অঞ্চল দিয়েই যাচ্ছি। মনে মনে ভাবলাম ভালোয়-ভালোয় কেটে পড়ি বাবা, উডি অ্যালেন যতই বলুক "লাইফ সাক্স", এত সুন্দর জীবন, বেঘোরে মরবো কেন? ভালুকপঙকে অনেক নীচে ফেলে আমরা দীরাং এর দিকে চলেছি, পথে পড়বে বোমডিলা, ভালুকপঙ থেকে বোমডিলা প্রায় তিরিশ কিলোমিটার এর একটু কমবেশি হবে, রাস্তা সঙ্কীর্ণ হলেও খারাপ না, সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে কোথায় যেনো দৃষ্টির অগোচরে চলে গেছে, পথের আশেপাশে সবুজের সমারোহ, মাঝে-মাঝে ঝরণার জল এসে রাস্তার উপর আছড়ে পড়ছে, দুচোখ ভরে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করছি। আমাদের গাড়িটা এখন অনেক উঁচুতে চলে এসেছে, নিচের দিকে তাকালে বেশ ভয়ও করছে, ভালুকপঙ ছেড়েছি অনেকক্ষণ, মাঝে দুএকবার থেমেছি, রাস্তাতে একজায়গাতে চায়ের সাথে ঝালমুড়ি খেয়েছি, ভারতীয় জওয়ানরা

রাস্তায় চা বিক্রি করে এখানে, আমার স্ত্রী ঝালমুড়ি সঙ্গে করে এনেছিলো, এরকম একটা প্রত্যন্ত জায়গাতে কনকনে ঠান্ডাতে এই দুটো জিনিস একসঙ্গে পেয়ে ধন্য হলাম। একটানা আরো কিছুটা চড়ার পর এবার গাড়ি নামতে শুরু করলো, কিছুক্ষণ পরেই আমরা বোমডিলা পৌঁছলাম ।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এত সৌন্দর্য থাকা সত্বেও অরুণাচলের পর্যটনশিল্পের পরিকাঠামোর তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি। এখানে নিম্নতম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক বেশি ব্যয় করতে হয়। বোমডিলাকে বেশ জনবহুল ও ব্যস্ত শহর মনে হলো, বাজার থেকে একটা ফ্লাস্ক কিনলাম, রঘু বললো "কাল সেলা পাস দিয়ে যাবার সময় আপনাদের এটা কাজে লাগবে।" অনেক উচ্চতায় অক্সিজেন অল্প থাকার কারণে অনেকের শরীর খারাপ হয়, গরম জল পান করলে নাকি স্বস্তি লাগে। বোমডিলাটা একটু ঘুরে দেখতে থাকলাম, ভাবতে অবাক লাগে যে বাষট্টির যুদ্ধের সময় চীনেরা এই বোমডিলা অবধি দখল করে নিয়েছিলো, দুই শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র এর মধ্যে অরুণাচল বিশেষ করে তাওয়াঙ-এর মালিকানা নিয়ে এখন জোর কাজিয়া চলছে, সেটা টের পেলাম যখন দেখলাম শয়ে-শয়ে ইন্ডিয়ান মিলিটারি কনভয় তাওয়াঙ-এর দিকে চলেছে। চীনেরা এখন অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ার পর অনেক জায়গাই নিজেদের বলে দাবি করছে, সে অরুণাচলের তাওয়াঙ হোক বা দক্ষিণ চীন সাগরের কোনো দ্বীপই হোক। শোনা যায় যে তাওয়াঙ-এর দুপাশেই ভারত আর চীন উভয়েই প্রচুর পরিমাণে সৈন্য মোতায়েন করেছে। মাঝে-মাঝেই ভাবি কবি, লেখক, প্রেমিক, বাচিক শিল্পীরা যদি রাষ্ট্র-এর কর্ণধার হতো তবে পৃথিবীটা হয়ত সুন্দর শান্তির জায়গা হতে পারতো ।

বোমডিলা কে বিদায় জানিয়ে আবার আমাদের পথচলা শুরু হলো, পথের এক অদ্ভুত মাদকতা আছে, একটা আলাদা নেশা আছে, তাই আনন্দ উত্তেজনার মধ্যেই গাড়িতে পুরনো দিনের হিন্দি গান শুনতে শুনতে আমরা দীরাং-এর দিকে অনেকটা চলে এসেছি। হঠাৎ খেয়াল হলো আমাদের ড্রাইভার রঘু খুব চুপচাপ হয়ে গেছে, একটু আগে পর্যন্তও ওর সাথে আমাদের প্রচুর বাক্যালাপ হয়েছে, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক কোনো বিষয়ই বাদ পরেনি, তবে লক্ষ্য করছি যত আমরা দীরাং-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছি ততো রঘু অন্য আলোচনা বন্ধ করে সেলা পাস নিয়ে কথা বলতে চাইছে, ও বলছে সেলা পাস ভয়ংকর বিপদজনক, কালকে ওটা পেরিয়ে আমাদের তাওয়াঙ পৌঁছতে হবে, অনেক কিছু ভাগ্যের উপর, প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে, হঠাৎ - হঠাৎ মেঘ এসে নাকি পুরো রাস্তাটাকে ঢেকে দেয়, কয়েকহাত দূরের জিনিসও একদম দেখা যায় না, অনেকসময় পুরো পাসটা তুষার-এ ঢাকা পরে যায়, তখন স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ কোনো গাড়িকে যেতে দেয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছুক্ষণ বিরতির পর ও আবার শুরু করেছে "সেলা পাস-এর মাঝপথেও গাড়ি আটকে যেতে পারে", ওর মুখটা এখন বেশ ফ্যাকাসে লাগছে, বেশ উপলব্ধি করছি যে ওর নার্ভাস লাগছে এই ভেবে যে কালকে ওকে সেলা পাস অতিক্রম করতে হবে, বুঝলাম, বিপদসঙ্কুল, দুর্গম, আনপ্রেডিকটেবিল সেলা পাস ওর আত্মবিশ্বাস-এ চিড় ধরিয়েছে, কিন্তু অস্বাভাবিক মনে হলো না কারণ সিডনীতে এই বেড়ানোর পরিকল্পনার সময় ইউ টিউব-এ সেলা পাস-এর ভিডিও দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়েছিলাম, দীরাং-এ আর মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবো, আগামীকাল সেলা পাস অতিক্রম করার ভয়, উত্তেজনা ক্রমশ আমাকে গ্রাস করছে।

দীরাং-এর হোটেলটা আমাদের সকলকারই খুব পছন্দ হলো, আমাদের ঘরটা বেশ ছিমছাম সাজানো, ভেতরটা পুরোটা কাঠের, হোটেলটা বেশ উচ্চতায় আর উত্তর হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী একে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রয়েছে। যতদূর মনে পড়ছে সন্ধ্যার কাছাকাছি আমরা দীরাং পৌঁছেছিলাম, মনে পড়ছে, কনকনে ঠান্ডাতে আমরা সবাই জবুথবু হয়ে গেছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা ডাইনিং হলে গিয়ে চা আর পকোড়া খেয়ে বেশ চাঙ্গা হলাম। ডাইনিং হলে দুটো ব্যাপার ঘটলো, এইগুলোর জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না। প্রথমটা হলো হলে ঢুকতেই আলাপ হলো দীপকের সাথে, বছর পঁচিশের এই বাঙালি হোটেল ম্যানেজার কয়েকবছর ধরে এই দীরাং-এ রয়েছে, ওর বাড়ি মেদিনীপুরে, ওকে দেখে মনে-মনে ভাবলাম কে বলে বাঙালি ঘরকুনো! এই ছোকরা মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবী সবাইকে ছেড়ে পেটের দায়ে এরকম প্রত্যন্ত, নির্জন, বিচ্ছিন্ন উত্তর হিমালয়ের একটা নিঃসঙ্গ উপত্যকায় দিনের পর দিন কাটাচ্ছে, মনে

হলো কোথায় যেনো আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা মিল আছে, আমিওতো অনেকদিন আগে ওর মতোই ঘর ছেড়েছিলাম, আমার মা যেমন আমার জন্য দুশ্চিন্তা করতেন, সুদূর মেদিনীপুরে ওর মা'ও নিশ্চয়ই ছেলের জন্য দুশ্চিন্তা করেন। দ্বিতীয় জিনিসটা যেটা দেখে বিস্মিত হলাম সেটা হলো টেবিলের ওপর প্রচুর কিউই ফল আর কিউই ফলের জ্যাম। দীপক অনেক বার পীড়াপীড়ি করার পর জ্যামটা একটু চেকে দেখলাম, একদম ভালো লাগলো না, মিষ্টিতে ভর্তি আর তাছাড়া সিডনীতে কিউই ফল খেয়ে-খেয়ে পেটে চড়া পরে গেছে। শুনলাম কয়েকবছর আগে এক নিউজিল্যান্ডের মহিলা দীরাংবাসীকে কিউই ফলচাষের পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন, আশা করি ভদ্রমহিলা স্থানীয় অর্থনীতিকেও কিছুটা চাঙ্গা করে যেতে সক্ষম হয়েছেন । বেশ কয়েকবার গরম ধোঁয়া ওড়া চায়ে চুমুক দেবার পর ডাইনিং হলের বাইরে আসতেই দেখি আমাদের ড্রাইভার রঘু, আমাকে আবার একবার ও মনে করালো যে কালকে তাওয়াঙের জন্য আমাদের খুব সকাল-সকাল রওনা হতে হবে ।

দীরাং-এর ব্যাপারে আর বিস্তারিত যাবো না তবে এটা অবশ্যই বলা দরকার যে পুরো যাত্রাপথে আমার স্ত্রীর দীরাংকে সবথেকে সুন্দর, শান্ত আর নিরাপদ মনে হয়েছিল। উত্তর হিমালয় যে কত সুন্দর হতে পারে তা দীরাংকে না দেখলে বোঝার উপায় নেই। নিস্তব্ধ, নৈসর্গিক দীরাং আমাদের বিশেষ করে আমার স্ত্রীকে এতো মুগ্ধ করেছিলো যে আমরা তাওয়াঙে একরাত্রি কম থেকে ফেরার পথে দীরাং-এ একরাত্রি বেশি কাটাই। আমার ছেলে খুব মোমো খেতে চাইছিলো, তাই আমরা সকলে বেশ তৃপ্তি সহকারে মোমো, ফ্রাইড রাইস আর চিকেন খেয়ে ঘুমোতে গেলাম। রাত্রে মোটামুটি ভালো ঘুমের পর, সকালবেলা স্ত্রী-ছেলেকে হোটেলে ঘুমন্ত রেখে মর্নিং ওয়াক এ বেড়িয়ে পড়লাম। ভারতে বা ভারতের বাইরে যেখানেই বেড়াতে গেছি সে রাজস্থানেই হোক বা জাপানেই হোক সকালবেলা পায়ে হেঁটে নতুন জায়গাতে নতুন-নতুন জিনিষ দেখার, আবিষ্কারের অদম্য নেশা আমার কখনো পিছু ছাড়েনি। সকালের পৃথিবীর একটা অদ্ভুত আলাদা অনুভূতি আছে, সকালে সবকিছুই বেশ তরতাজা মনে হয়, শরীর, মন, গাছপালা, আকাশ, পাহাড়, নদী সবকিছুই। হোটেলের থেকে বেশ নিচুতে প্রায় চারশো মিটার দূরে দেখলাম এক ভারতীয় জওয়ান রাইফেল উঁচিয়ে ওদের ক্যাম্পের সামনে প্রহরা দিচ্ছে, পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় একটু কথা বলার ইচ্ছা হলো, কথায়-কথায় বললাম যে আমরা আজ তাওয়াঙ যাচ্ছি, ও অভয় দিলো যে আকাশ পরিষ্কার থাকার জন্য ও গতরাতে তুষারপাত কম হওয়ার জন্য আজ সেলা পাস খোলা থাকবে, তবে তিনদিন আগে সেনাবাহিনী প্রচন্ড তুষারপাতের জন্য নিরাপত্তার কারণে সেলা পাস বন্ধ করে দিয়েছিলো, সবকটা গাড়ি নাকি আবার দীরাংএ ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। মিনিট পাঁচেক কথা বলার পর আরো খানিকটা হেঁটে হোটেলে ফিরে এসে আমরা সবাই গরম-গরম আলুপরোটা খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখা দরকার যে ভালুকপঙে আমাদের সাথে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাঙালি পরিবারের সাথে আলাপ হয়েছিল, এরা সবাই একই পথের পথিক, সবাই কাল রাতটা এই দীরাংএরই বিভিন্ন হোটেলসে কাটিয়েছে, সকালবেলা সাত-আটটা গাড়ির ড্রাইভার আর আমরা সবাই মিলে সর্বসম্মত ভাবেই ঠিক করলাম যে আমরা একসাথে সেলা পাস পার হবো মানে একটা গাড়ির পেছনে আর একটা গাড়ি খুব দূরে যেনো না থাকে, উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কেউ যদি কোনো রকম বিপদে পড়ে বা কোনোরকম সংকটজনিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তবে অন্যরা যাতে সাহায্যের হাত বাড়াতে পারে ।

দীরাং থেকে দলবেঁধে আনন্দ-উত্তেজনা-ভয় সবাইকে সঙ্গী করে আমাদের পথচলা শুরু হলো, কয়েক কিলোমিটার যেতে না যেতেই প্রকৃতি তার রংরূপ বদলাতে শুরু করলো, গাছপালা অনেক কমে যেতে লাগলো, সেলা পাস সমুদ্রতল থেকে প্রায় ১৩,৭০০ ফুট ওপরে, গাড়ির মধ্যে আমাদের ড্রাইভার রঘুকে বেশ ভীত লাগছে, তবে, ওকে আমি অনেকবার অনুরোধ করেছি যে খুব আস্তে গাড়ি চালাতে, কয়েকবার ওকে মনে করিয়ে দিয়েছি যে গৌহাটিতে ওর মেয়ে আর স্ত্রী ওর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে, এটা স্বীকার করতেই হবে যে রঘু বেপরোয়া ড্রাইভার না, একটা ভালো ট্রিপ এডভাইস সাইটে ওর সম্মন্ধে ভালো রিভিউ দেখার পর ওকে আমি নিয়োগ করেছিলাম। রঘু সুন্দর সন্তর্পনে গাড়ি চালিয়ে সেলা পাশের অনেকটা কাছে চলে এসেছে, সংকীর্ণ খাড়াই পাসটা ক্রমশ দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করেছে, আরো কিছুটা চলার পর আমাদের একটানা ওপরে ওঠা শুরু হলো, তুষারপাত চোখে পড়ছেনা, কিন্তু যেদিকে চোখ যায় মনে হচ্ছে শ্বেতশুভ্র পেঁজা তুলো পুরো

পর্বতমালা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে মেঘেদের ছাড়িয়ে এ কোন রূপকথার রাজ্যে আমরা চলেছি, আনন্দে আবেগে গাড়িতে পুরোনো দিনের হিন্দি গান শুনতে-শুনতে বিপদসংকুল সেলা পাশের অনেক উঁচুতে চলে এসেছি আমরা ।

মেঘেদের ছাড়িয়ে আরো উঁচুতে যখন চলে এসেছি, লক্ষ্য করলাম পর্বতগাত্রের অধিকাংশই তুষারে ঢাকা, কিছু-কিছু পাইনের মতো দেখতে গাছগুলোর ওপর ঝুরঝুরে বরফ আর পর্বতশ্রেণীর বিপরীতে মেঘেদের ঢেউ । কিছুক্ষণের জন্য মনে হলো আমি যেনো এক মায়াবী জগতে পৌঁছে গেছি, দুচোখ ভরে সেলা পাসের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে ভুলেই গেছিলাম যে সংকীর্ণ পিচ্ছিল রাস্তাটা বেশ বিপদজনক, গতরাতে প্রচন্ড তুষার পাতের প্রমান সর্বত্র, বেলা বাড়ার সাথে-সাথে তুষার ঢাকা রাস্তা ক্রমশ তুষার গলে আরো পিচ্ছিল হতে শুরু করেছে । মাঝে-মাঝেই সূর্যের আলো তুষারের চাদরে আবৃত পর্বতশ্রেণীর ওপর রং ঢেলে আবার গা-ঢাকা দিচ্ছে, এখন আর একদমই গাছপালা চোখে পড়ছে না, চারিদিকেই ন্যাড়া পাহাড়, আরো কিছুক্ষণ চলার পর আমাদের গাড়ী তাওয়াঙ-এর দিকে সেলা পাসের তোরণদ্বারে পৌঁছালো, বুঝলাম আমরা সেলা পার করলাম, সত্যি বলতে কি আমার উৎকণ্ঠার অবসান হলো, আমার মনে আছে সিডনীর বাড়িতে যখন ইউ টিউব-এ আমি আর আমার ছেলে যখন সেলা পাস-এর ভিডিওটা দেখছিলাম, ছেলে সঙ্গে-সঙ্গে ভিডিওটা দেখার পর বলেছিলো "বাবা, মাকে এটা দেখিওনা, মা ভয় পাবে আর যাবেও না ।" শুধু আমি কেনো, এখানে পৌঁছে আমরা সবাই বেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম । এখানে আমাদের গাড়ীটা প্রায় মিনিট কুড়ি দাঁড়ালো, অনেকটা ঘুরে-ঘুরে দেখলাম, বরফ জমা নিরেট সেলা সরোবরের আশেপাশে বেশ কিছু ছবি তোলা হলো, স্থানীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস যে সেলা পাসের আশেপাশে একশো একটা এরকম সরোবর রয়েছে । এখানে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমান কম থাকার জন্য একটু মাথা ঘুরলো, গরম জল খেলাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হয়ে গেলো । সময় কোথায় সময় নষ্ট করার, সবাই গাড়ীতে উঠলাম, গন্তব্যস্থল তাওয়াঙ ।

মিনিট কুড়ি বাদে আমাদের পথের বন্ধু চ্যাটার্জী পরিবারের গাড়ীটির চাকা পিছলে গিয়ে পাহাড়ের ধারের বরফের গর্ততে আটকে গেলো, আমরা সবাই নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলাম, কিছুটা সময় ধরে অনেক টানা-হ্যাঁচড়া করে গাড়ীর চাকাকে গর্ত থেকে উদ্ধার করা হলো আর তার সাথে-সাথে দলবদ্ধভাবে যাত্রা করার সুফলও উপলব্ধি হলো । সবাই মিলে হৈ-হৈ করে আবার নিজ-নিজ গাড়ীতে বসে পথ চলা শুরু হলো, যতদূর জানি সেলা পাস থেকে তাওয়াঙ-এর দূরত্ব প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার, পথে নানান জায়গাতে থামাও হচ্ছে, এরকমই একটা জায়গাতে আমরা আবার থামলাম, এটা যশবন্তগড় ওয়ার মেমোরিয়াল, বাষট্টির যুদ্ধে এই যশবন্ত নামে ভারতীয় সিপাহী প্রবল পরাক্রমে চীনাদের সাথে লড়েছিল, এখানে এই ওয়ার মেমোরিয়ালের ঠিক সামনেই মিলিটারি ক্যান্টিন আর তার ঠিক পাশেই সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা আমাদের মতো যাত্রীদের গরম-গরম সিঙাড়া আর চা বিনা পয়সায় বিতরণ করলো, এই কনকনে ঠান্ডায় দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে এই দুর্লভ জিনিসগুলো পেয়ে জওয়ানদের কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুললামনা ।

যশবন্তগড় ওয়ার মেমোরিয়াল থেকে ঠিক কতক্ষণ তাওয়াঙ পৌঁছতে লেগেছিলো ঠিক মনে নেই, এই যাত্রাপথের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন তেমন দেখিনা, তবে কোনো একজায়গায় আমাকে রঘু আমাদের চলার পথে ডানদিকের একটা কোনাকুনি বরফমোড়া পর্বতচূড়া দেখিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিলো "ওই পাহাড়ের পেছনেই চীন," ওর কথা শুনে কেমন যেনো একটা জিও-পলিটিকাল এডভেঞ্চার এর গন্ধ পেলাম, রঘু যে চীন বলতে চীন অধিকৃত উত্তর তিব্বতের কথা বলছে সেটা বুঝলাম । আমরা প্রায় তাওয়াঙ-এর কাছাকাছি এসে গেছি, প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে এই অঞ্চলটা অনেকদিন থেকেই বেশ বিতর্কিত, এবং ম্যাকমোহন প্রস্তাবিত ভারত আর চীনের সীমারেখার আগে পর্যন্ত এই অঞ্চলটা দক্ষিণ তিব্বতের অঞ্চল হিসাবে মানা হতো, এমনকি দলাই লামাও তাওয়াং কে একসময় তিব্বতীয় ভূখণ্ড বলে মনে করতেন । চীন তাওয়াঙ কে কখনোই ভারতীয় ভূখণ্ড বলে মানতে নারাজ, সম্প্রতি ভারত সরকার দলাই লামাকে তাওয়াঙ-এ আমন্ত্রণ জানানোতে বেইজিং ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, ওরা অরুণাচলে প্রস্তাবিত রেল পরিকাঠামো নির্মাণেরও বিরোধিতা করছে ।

সূর্যাস্তের অনেক আগেই আমরা আমাদের তাওয়াঙ-এর হোটেলে ঢুকে গেলাম, অত্যন্ত প্রান্তিক, কিন্তু সুন্দর ঐতিহাসিক সীমান্ত শহর তাওয়াঙ, এইখানে আসতে-আসতে মনে হচ্ছিলো কি বিচ্ছিন্ন এই জায়গাটা, স্থলপথ হচ্ছে একমাত্র ভরসা, রেল যোগাযোগ নেই, আগে শুনেছি হেলিকপ্টার পরিষেবা ছিল, আমরা যখন যাই সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান শহর গৌহাটি ফিরে যেতে প্রায় বারো তেরো ঘন্টা লেগে যাবে তাও যদি রাস্তাঘাট সব খোলা থাকে, প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল হয় । তাওয়াঙ এ ভাগ্যটা আমার প্রতিকূল ছিলো, হোটেলের ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই স্ত্রীর কাছে বেশ গালিগালাজ শুনতে হলো, আসলে আমার স্ত্রীর তাওয়াঙ-এর এই হোটেলটা একদমই পছন্দ হয়নি, পাঠকদের আমি আগেই বলেছি যে এইসব জায়গাতে ভালো হোটেলের খুবই অভাব, আমাদের ঘরটা থেকে জানালা দিয়ে উঁকি মারলে ভাঙাচোরা কিছু কাঠের বাড়ি আর জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না, কোথায় সেই সুন্দরী তাওয়াঙ! তার মধ্যে আবার অতিরিক্ত ঠান্ডাতে হোটেলের জলের পাইপ ফেটে গেছে, ঘরের ভেতরে হিটার থাকা সত্বেও অস্বাভাবিক রকমের স্যাঁতসেঁতে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা ।

আবার "গোদের ওপর বিষফোঁড়ার" মতো আমার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়লো, দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে আমার স্ত্রী বলে যাচ্ছে "এই তোমার তাওয়াঙ, এইখানে কেউ তিনরাত্রি থাকে, দুরাত্রির বেশি আমি এখানে থাকবো না ।" আমি যত বোঝাচ্ছি যে আমাদের ঘরটা বাজে দিকে পড়েছে, তাওয়াঙ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, ও কিছুতেই বুঝতে চাইছে না । যাই হোক প্রিয়জনদের এখানে এসে আনন্দ হচ্ছেনা দেখে আমার উৎসাহেও বেশ ভাঁটা পড়লো,যথেষ্ট দমে গেলাম । ছেলের শরীর খারাপের জন্য বেশ ভয়ও পেলাম, এই প্রান্তিক দুর্গম সীমান্ত শহরে স্বাস্থ্যপরিষেবা নিশ্চয়ই খুব একটা ভালো হতে পারে না । কেউ একজন পরামর্শ দিলো বাজারে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আনতে, গাড়ী নিয়ে চললাম ডাক্তার খুঁজে বের করতে, আলো-আঁধারির মাঝে গাড়িটা এঁকেবেঁকে অনেকটা নিচে নেমে এলো, রঘুর এইসব জায়গা গুলো গুলে খাওয়া, নির্দেশমতো ডাক্তারের বাড়ি ঠিক পৌঁছে গেলাম । তাওয়াঙ-এর এই তরুণ ডাক্তারটি খুব যত্ন নিয়ে আমার ছেলেকে দেখলেন, অভয় দিলেন যে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, আমাদেরকে মিনিট পাঁচেক দূরে একটা ওষুধের দোকানে নিয়ে গেলেন, ওনার ব্যবহার, আন্তরিকতা আর পেশাদারিত্ব দেখে মুগ্ধ হলাম । কথায়-কথায় বললেন উত্তরবঙ্গের এক মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে এখানে নিজের জায়গাতে ফিরে এসে উনি প্র্যাক্টিস শুরু করেছেন । যখন হোটেলের দিকে ফিরছি, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে, বেশ নির্জন, পাহাড়ের এই গলি, উপগলি দেখে বেশ রোমাঞ্চ লাগলো, মনে হলো লোমহর্ষক, রোমাঞ্চকর কাহিনীর পটভূমিকা এর থেকে আর ভালো হতে পারে না ।

ওষুধগুলো খেয়ে আমার ছেলের শরীরটা কিছুটা ভালো হলো, জ্বরটা কিছুটা কমলো, স্ত্রীর আর ছেলেকে অনেকটা উৎফুল্ল দেখে আমার মনমরা ভাবটা বেশ কমে এলো । পুরো তাওয়াঙ জুড়েই আলো গুলো টিম-টিম করে জ্বলছে, মাঝে-মাঝেই লোডশেডিং, হোটেলেরও এক অবস্থা । এখানকার স্থানীয় লোকেদের একটা বড়ো অভিযোগ যে তাওয়াঙ জাতীয় নিরাপত্তার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর হওয়া সত্ত্বেও খুবই অবহেলিত, অথচ সীমান্তের ওপারে চীন নাকি পরিকাঠামোর প্রভূত উন্নতি করেছে । নৈশাহারের সময় হয়ে এলো, হোটেলের ডাইনিং হলে প্রবেশ করলাম, হলটা কেমন লম্বাটে মতন, সামনের দিকে বসলে ঠান্ডায় কাঁপতে হবে কারণ দরজাটা দিয়ে হাওয়া আসছে, আবার ভেতরের দিকে যেতে পারছি না, একটা চোদ্দ পনেরোজনের মতো ফ্রেঞ্চ ট্যুরিস্টের দল আর তাদের লোকাল ট্যুর গাইড ডাইনিং হলের হিটারটা দখল করে পুরো জায়গাটা আটকে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে, অনেকের আপত্তি সত্বেও ওদের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখলাম না । লোকাল ট্যুর গাইড আর ফরাসি দলটার অভব্য আচরণ অনেক্ষন ধরে দেখার পর আর ঠিক থাকতে পারলাম না, ভদ্রভাবে প্রতিবাদ করলাম, প্রথমেই গাইডটা তেড়েফুঁড়ে উঠে হুমকি দিলো, ড্রাইভার রঘু আমাদের তরফ থেকে প্রতিবাদ করে উঠলো, ও গাইডটার হুমকির শিকার হলো বেশি । গাইডটার চেহারা আর আচার-আচরণে গুন্ডামির ছাপ সর্বত্র । তবে যেটার জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না সেটা হলো, যে ফরাসি লোকটি ওদের দলনেতা ছিলেন, সে ভারতীয়দের সমক্ষেই ভারতীয় ভূখণ্ডে বসেই আপত্তিকর কথা শুরু করলেন, আমাদের গোটা পরিবার প্রতিবাদ করে উঠলো, গাইডটাকে বললাম "তোমার লজ্জা করছে না একজন ভারতীয় হয়ে তুমি শুনে গেলে, কিছু বললে না ।" ও তখন মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ।

তথাকথিত ফরাসি সভ্যতার লিবেরালিজম-এ আপাত চাপা পড়া জাতিবিদ্বেষ আর বর্ণবিদ্বেষ কিছুক্ষণের জন্য সেই সময় মাথাচাড়া দিয়েছিলো । ওই ফরাসি লোকটি নাকি নতুন দিল্লীর ফরাসি দূতাবাসে অনেককাল কাজ করেছেন। সেদিনকার ঘটনার পর অনেকবার মনে হয়েছে, সত্যিই কি ভারতবাসী আজও উপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে! যাই হোক শেষে ওরা ক্ষমা চেয়ে নেওয়াতে আমরা আর কোনো ঝামেলায় জড়ানো শ্রেয় মনে না করে রীতিমতো খ্যাঁচড়া মন নিয়েই ঘরে শুতে চলে গেলাম । ভ্রমণ মানুষকে যে কত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে তা ভাষায় বর্ণনা করা সত্যিই কঠিন ।

পরের দিন সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশ সেরে তাওয়াঙ শহর থেকে বেশ উঁচুতে "মাধুরী লেক" দেখতে গেলাম, ভালো লাগলো, তবে আহামরি কিছু না। গত কয়েকদিন ধরে রঘু একটানা বলে যাচ্ছিলো যে ও আমাদের মাধুরী লেক দেখাতে নিয়ে যাবে, "কয়লা" ছবির শুটিংয়ে মাধুরী দীক্ষিত নাকি প্রচন্ড ঠান্ডাতেও সরোবরে নেমেছিলো, শুটিংয়ের পর থেকেই লেকটা "মাধুরী লেক" নামেই খ্যাত। মনে-মনে ভাবলাম এখানে এতো সুন্দর-সুন্দর স্পট থাকতে শেষে কিনা রঘু তোমার মাধুরী লেকই মনে ধরলো। এইখান থেকে আমরা তাওয়াঙ মনেস্ট্রির দিকে চললাম, রঘুর "মাধুরী লেক" যতই মনে ধরুক, আমার কাছে তাওয়াঙ এর প্রধান আকর্ষণ হলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তিব্বতী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের এই ঐতিহাসিক মনেস্ট্রি। কি বিশাল এই মনেস্ট্রিটা, সুন্দর এর স্থাপত্য, পাহাড়ের গায়ে বিশাল গর্বে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি আর রাজনীতির প্রতীক হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শুনেছি এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রচুর পুঁথি-পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে, ভেতরে অতি উচ্চ বৌদ্ধমূর্তি দেখলাম, আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো যে দলাই লামা যখন অধিকৃত তিব্বত থেকে চীনাদের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতে চলে আসেন, এই মনেস্ট্রিতে এসেই প্রথম কিছুদিন কাটানোর পর তেজপুর যান। আরো কিছু জায়গা ঘুরে আমরা ক্লান্ত হয়ে হোটেলে পৌঁছোলাম, আজই তাওয়াঙ-এ শেষ রাত্রি, কাল আমরা ফেরার পথে দীরাংয়ে একরাত্রি থেকে পরশুদিন গৌহাটি পৌঁছাবো, মনটা একটু খারাপ লাগছে, আমাদের সাধের তাওয়াঙ ভ্রমণ শেষ হয়ে এলো, কিন্তু স্মৃতি রোমন্থনের পালাতো সবে শুরু হলো।

সন্দীপ ভট্টাচার্যী সিডনী প্রবাসী কবি, বাচিকশিল্পী, লেখক ও নাট্যব্যক্তিত্ব, বহুদিন ধরে লেখালেখি ও নাট্যজগতের সঙ্গে যুক্ত। সন্দীপের ভ্রমণকাহিনী ওর লেখনীতে এক নতুন মাত্রা পায়।

মহুয়া সেনগুপ্ত

অন্নপূর্ণার হেঁশেল

র‍্যাটাটিউই

বাঙালি হেঁশেলে বহু দেশ বিদেশের রান্নাই ঢুকে গেছে। যেমন নারকেল দিয়ে রান্না। মালাইকারি নাকি মালয় প্রদেশের আমদানি! কোঙ্কানি রান্নার নারকেল ছাড়াও গরম মশলার ব্যবহার কি বাংলার রান্নাকেও ঋদ্ধ করেনি? মালয় দস্যুর আক্রমণ বা বর্গী হানার সঙ্গে সঙ্গে তাদের রান্নারও প্রভাব চলে এসেছিল বাঙালি কুইজিনে। আর আজ তো বাঙালি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা পদের সঙ্গে সাদরে চাইনিজ, ইতালিয়, স্প্যানিশ রান্নাও সাদরে কাছে টেনে নিয়েছে।

আজ একটা পদের কথা বলবো যেটা আমি শিখেছি বাচ্চাদের সঙ্গে অ্যানিমেশন ছবি দেখতে গিয়ে। র‍্যাটাটিউই (Ratatouille) বলে পিক্সারের বিখ্যাত অ্যানিমেশন ছবিটির কথা মনে আছে নিশ্চয়ই অনেকের। সেই যেখানে শেফ রেমি নামের ইঁদুরটি অসামান্য সব পদ রান্না করতো মালিক লিঙ্গুইনির হয়ে! খাদ্য সমালোচক (food critic) অ্যান্টন ইগোর মন জয় করতে সে রান্না করে ফরাসি গ্রামীণ এই পদ। ফরাসি গ্রামদেশের এই খাবারটি এখন এক্সোটিক তকমা পেয়ে দামি রেস্তোঁরায় কীভাবে চলে এলো তার গল্প।

যাঁরা দেখেছেন ছবিটি, তাঁরা জানেন। অন্যদের বলি, বাকিটা জানতে গেলে ছবিটি দেখতে হবে। পদটিও রান্না করুন, বাচ্চারা শুধু নয়, বড়দেরও ভালো লাগবে !

প্রণালী:-

একটি বেক করার পাত্রে অলিভ অয়েল ব্রাশ করে, টোম্যাটো-রসুন সসের বেস বানিয়ে তার ওপর দিতে হয় বেশামেল সস্। টোম্যাটো সস্ বানাতে দুটো বড় টোম্যাটো মাইক্রোওয়েভ আভেনে অল্প জল দিয়ে সেদ্ধ করে পিউরি বানিয়ে নিতে হবে। একটি প্যানে অলিভ অয়েল দিয়ে রসুন কুচি দিয়ে পিউরিটা ঢেলে দিন। এক টেবিল চামচ ওয়াইট ওয়াইন অথবা ভিনিগার দিন। নুন, গোল মরিচ গুঁড়ো, থাইম, চিলি ফ্লেক্স আর জায়ফল গুঁড়ো দিয়ে সস্ তৈরি করে নিন। বেশামেল সস্ বানাতে একটি প্যানে ৫০ গ্রাম মাখন দিয়ে তাতে এক টেবিল চামচ ময়দা দিয়ে কম আঁচে নাড়তে হবে। আগে থেকে

গরম করে রাখা এক কাপ দুধ এই মিশ্রণে দিয়ে নাড়তে থাকতে হবে। নুন গোল মরিচ গুঁড়ো দিয়ে সিজনিং করতে হবে। মশলা বলতে চিলি ফ্লেক্স, পারস্লে আর থাইম। তৈরি হয়ে গেল আপনার সাদা বেশামেল সস্। বেস সস্ আর বেশামেল সস্ একটু মিশিয়ে গোল গোল, পাতলা পাতলা করে কেটে রাখা সবুজ জুকিনি, হলুদ জুকিনি বা স্কোয়াশ, বেগুন, গাজর, আধ সেদ্ধ আলু, সবুজ আর লাল বেল পিপার স্পাইরাল করে সাজিয়ে দিন। নুন গোল মরিচ দিয়ে সিজনিং করুন। ওপরে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল ছড়িয়ে প্রি হিটেড আভেনে ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৫০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা বেক করুন। বেকড হয়ে গেলে, এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল, জায়ফল গুঁড়ো আর থাইম ছড়িয়ে গরম গরম সার্ভ করুন। গারান্টি দিচ্ছি, সবার পছন্দ হবে। যাঁরা নিরামিষ খাবেন, বেস সসে রসুন দেবেন না।

মহুয়া সেনগুপ্ত – জন্ম উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে। বড় হয়ে ওঠা হুগলি শহরে। শিক্ষা অক্সিলিয়াম কনভেন্ট, ব্যান্ডেল। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শারীরবিদ্যায় স্নাতক। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি। পেশা অধ্যাপনা ও গবেষণা। বর্তমানে, ভারতের আসাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরে বায়োটেকনোলজি বিভাগে কর্মরত। ছ'টি কাব্যগ্রন্থ, এ আমার ছায়াজন্ম (পরম্পরা প্রকাশন, ২০০৯), চিরহরিৎ গাথা (সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৮), তারামাছ নাকছাবি (বইওয়ালা বুক ক্যাফে, ২০২০), বৃষ্টিদ্বীপের কবিতা (পরম্পরা প্রকাশন, ২০২১), প্রেমের কবিতা (সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০২১) ও উনিশ বসন্তের নির্জনতা (কমলিনী প্রকাশন, ২০২২) এখনও অবধি প্রকাশিত। সখ, বই পড়া, গান শোনা, রান্না করা।

বাতায়ন প্রকাশনা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হল দুটি বই। দুজনেই প্রবাসী লেখক।

সুজয় দত্তের **"এক বাক্স চকোলেট"** নানা স্বাদের গদ্যরচনার একটি সংকলন। আমেরিকার ওহিও রাজ্যের ক্লীভল্যান্ড নিবাসী সুজয়ের লেখায় বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসা ও দীর্ঘ প্রবাস জীবনের অম্লমধুর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। তবে সবকিছু ছাড়িয়ে যা পাঠকদের আকর্ষণ করে তা হল লেখকের আন্তরিকতা আর সততা।

সিডনিবাসী সঞ্জয় চক্রবর্তীর দ্বিতীয় কবিতার বই **"ধুলো রংয়ের বিকেল"**। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ **"মেঘযাপন"** এর থেকে ভিন্নধর্মী কবিতার সংকলন। কবি যে কবিতার আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তার প্রতিফলন এ বইতে। বইয়ের নামের মতোই কবিতাগুলিতে এক আলোআঁধারিময় কাব্যধর্মিতা।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

আমরা থাকছি কলকাতা বই মেলা - ২০২২ – বাতায়ন স্টলে । আমাদের সব বই স্টলেতেও পাওয়া যাবে ।

এক বাক্স চকলেট

সুজয় দত্ত

ধুলো রংয়ের বিকেল

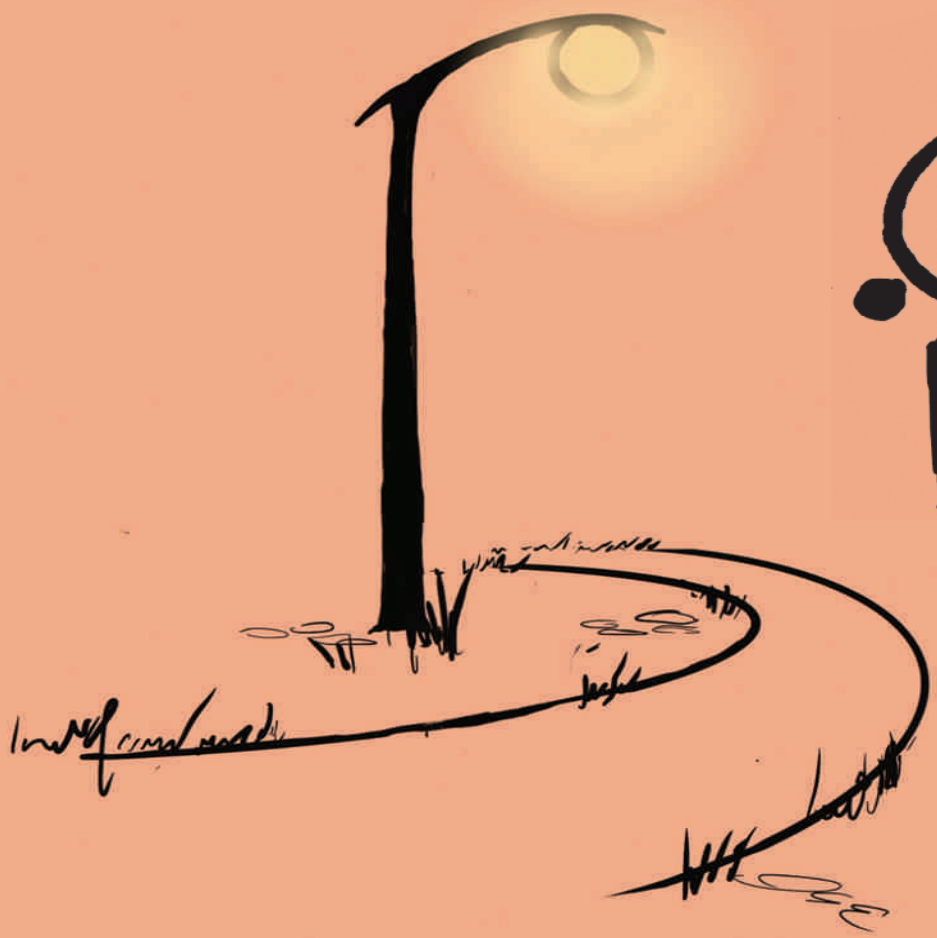

সঞ্জয় চক্রবর্তী